অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ • সংখ্যা-২০ • বর্ষ-৫

প্রত্যয়
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ • সংখ্যা-২০ • বর্ষ-৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন
নজরুল ইসলাম

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

স্যার ফজলে হাসান আবেদ : এক উন্নয়ন মহানায়কের প্রয়াণ

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা, দারিদ্র্য নিরসন ও জাতীয় উন্নয়নের কিংবদন্তী মহানায়ক ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক স্যার ফজলে হাসান আবেদকে আমরা হারিয়েছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের তৃণমূল মানুষের সেবা করার লক্ষ্যে তিনি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, এক লাখ কর্মীর সমন্বয়ে পৃথিবীর ১১টি দেশের ১২০ মিলিয়ন মানুষকে বিভিন্ন সেবা দিয়ে চলেছে ব্র্যাক। বেসরকারি উন্নয়নে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া স্যার ফজলে হাসান আবেদ তাঁর কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমুজ্জ্বল করেছেন। মূলতঃ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য সেবাসহ নারীর ক্ষমতায়ণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া ব্র্যাকের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। স্যার ফজলে হাসান আবেদ উদ্ভাবিত ব্র্যাকের কার্যক্রমের ওপর গবেষণা করেই নোবেল জিতেছেন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ও দুফলো। দারিদ্র্য নিরসনের মহান এই সারথীকে নিয়ে প্রত্যয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। এটিই ছিল ওনার জীবদ্দশায় শেষ স্বীকৃত প্রতিবেদন।

একটি অভিজাত, স্বচ্ছল পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তান হয়েও সারাজীবন তিনি দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে থেকেছেন, ব্র্যাকের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই মহান মানবতাবাদী সমাজচিন্তক দেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিশ্চিত করেছেন। দেশপ্রেমিক এই মানুষটি কর্মক্ষেত্রে ছিলেন অদম্য। কোনো বাধা বিপত্তিই তাঁকে দারিদ্র্য নিরসনের কর্মযজ্ঞ থেকে ফেরাতে পারেনি।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক '৭১ সালে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলাকালে একটি বিদেশি সংস্থার চাকরির সুবাদে নিজে নিরাপদ অবস্থানে থাকলেও ভীষণ ঝুঁকি নিয়েই দেশ ত্যাগ করে লন্ডনে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' ও 'হেলপ বাংলাদেশ'। উন্নয়ন চিন্তার দূরদর্শী এই মানুষটি স্বাধীনতার পর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র পতাকা ও মানচিত্র লাভের স্বাধীনতা দিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে না, এর জন্যে প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তিনি ১৯৭২ সালে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ রিহ্যাবিলেটিশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি সংক্ষেপে 'ব্র্যাক'। সরকার ব্যবস্থার বাইরে তিনিই প্রথম বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পথ ধরেই বুরো বাংলাদেশসহ দেশে শত শত এনজিও সংগঠন গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এই সেক্টর আজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যার ফলে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

উন্নয়নদর্শী মানবিক ব্যক্তিত্ব স্যার ফজলে হাসান আবেদ লোকান্তরিত হলেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আড়ং ও ব্র্যাক ব্যাংকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকবেন।

বুরো বাংলাদেশ ও প্রত্যয় পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। আমাদের প্রত্যাশা তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরসূরীগণ ও সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ তাঁর আদর্শিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরো গতিশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন।

কালের চক্রে হারিয়ে গেছে খ্রিস্টিয় বছর ২০১৯। আগমন ঘটছে ২০২০ এর। জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা পালনকারী সকল সহযোগীসহ দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বুরো বাংলাদেশ এর সর্বস্তরের কর্মী ও উপকারভোগী সদস্যদের যারা দেশের উন্নয়ন অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রত্যয়-এর অগণিত পাঠকের প্রতিও রইল আমাদের শুভকামনা। শুভ নববর্ষ ২০২০।

আশা : দারিদ্র্য নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিত

ফেরদৌস সালাম

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশ ছিলো ক্ষুধা ও দারিদ্রপীড়িত এক অনুন্নত দেশ। সেই সাথে অশিক্ষা-কুসংস্কার ও বেকারত্ব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয় এ জাতিকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে দারিদ্র্য নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন ও তৃণমূলের মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এনজিও 'আশা'। কয়েকজন স্বাপ্নিক তরুণ সঙ্গীকে নিয়ে মানিক-গঞ্জের টেপরা গ্রামে তারুণ্যের অহংকার সংগঠক মো. সফিকুল হক চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন এই উন্নয়ন সংগঠন। নিতান্ত এক ক্ষুদ্র পরিসরে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ ৪১ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়েছে। দেশব্যাপী আশার শাখার সংখ্যা : ৩০৫৫, কর্মী সংখ্যা : ২৬৩২০, সদস্য সংখ্যা : ৬৮ লাখ, সদস্য সঞ্চয় স্থিতি : ৮৮৫৭ কোটি টাকা, ঋণ স্থিতি : ১৫৮৪৯ কোটি টাকা এবং পুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ : ২২৯৮৫৮ কোটি টাকা (সেপ্টেম্বর '১৯)। উল্লেখ্য, আশার প্রতিষ্ঠাতা মো. সফিকুল হক চৌধুরী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আশাকে তার দীর্ঘ যাত্রাপথের উন্নয়ন বিবেচনায় দু'টি ভাগে ফেলা যায়। একটি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯০, অন্যটি ১৯৯১ থেকে আজ অবধি। প্রথমভাগে আশা ছিল পুরোপুরি অনুদান নির্ভর একটি এনজিও। সেই সময়ে বিদেশি দাতাদের সহায়তায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়ন ও সহায়তাকল্পে আশা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। তবে আশা'র জন্য বিদেশি অনুদান স্বস্তিকর ছিল না। আশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মো. সফিকুল হক চৌধুরী উপলব্ধি করলেন যে, অনুদানের ওপর নির্ভর করে বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ দুরূহ কাজ এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দূরাগত এক স্বপ্ন মাত্র। এই উপলব্ধিই আশাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ খুঁজে নিতে অনুপ্রাণিত করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সালে আশা বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূত্রপাত করে। এটি ছিল আশার জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উদ্ভাবনমূলক, ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই।

নিজের পায়ে আশা

আশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম স্বল্প সময়ের মধ্যেই অভাবনীয় সফলতা অর্জন করে এবং এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে আশা দেশের অন্যতম সেরা ক্ষুদ্রঋণ সংস্থায় পরিণত হয়। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে আশা অনুদানহীন প্রতিষ্ঠানের নজির স্থাপন করে। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ফর্বস ম্যাগাজিন আশাকে বিশ্বের এক নম্বর টেকসই ও দক্ষ এমএফআই হিসেবে নির্বাচিত করে। ২০০৮ সালে দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস লন্ডন ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) আশাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এমএফআই হিসেবে Banking at the Bottom of the Pyramid পুরস্কার প্রদান করে। 'আশা ক্ষুদ্রঋণ' মডেলের সাফল্যে অনুপ্রাণিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ আশার কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা নিয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সেক্টর

প্রসঙ্গত একটি বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন যে, আশা প্রতিষ্ঠার সময় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। সত্তরের দশকে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের হার ছিল প্রায় ৮০ ভাগের কাছাকাছি– যা এখন প্রায় ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র প্রায় ২০ ভাগের মতো, যা এখন ৭০ ভাগেরও বেশি। এক সময় এ দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪০-৪৫ বছর, এখন তা ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। বর্তমানে দেশের পাঁচ বছর বয়সী প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে। গ্রামীণ মানুষের জীবনেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এখন বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। প্রায় ১০ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। এসব বস্তুগত

উন্নতিই প্রমাণ করছে, দেশে দারিদ্র্যের হার অনেক কমেছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ১৯০০ মার্কিন ডলারের ওপরে। অর্থনীতির এ সকল ইতিবাচক ধারা বাংলাদেশকে অসীম সম্ভাবনার দেশে পরিণত করেছে।

দেশের এই অভাবনীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পেছনে এনজিও সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আশা'র অবদান অনেকখানি। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের ক্ষেত্রে 'আশা' অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আশার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১ সালে আশা বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রবর্তন করে। বর্তমানে আশার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাফল্য ব্যাপক। এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সরাসরি যুক্ত প্রায় ৬৮ লাখ সদস্য, যাদের ৯৬ শতাংশই নারী। এসব সদস্যের পরিবার-প্রতি গড়ে ৪ জন সদস্য ধরা হলেও আশার ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকারভোগী মানুষ এখন প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে আশা ৩২,০০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত আশা পুঞ্জীভূতভাবে ২,২৯,৮৫৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

রেমিটেন্স ও এসএমই ঋণ

প্রবাসীদের রেমিটেন্স দ্রুত সুফলভোগীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আশার নেটওয়ার্ক সুবিস্তৃত। দক্ষ কর্মীরা দ্রুত এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আশা রেমিটেন্স কার্যক্রমের আওতায় ৬৩৭ কোটি টাকা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আশা ২০১৭ সালে এসএমই (ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তা ও ব্যবসা ঋণ) কার্যক্রম চালু করে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৬১৬৬ জন ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীকে ৩২০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

আশার স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন

আশা শুধু ক্ষুদ্রঋণের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান নিশ্চিত করছে। রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম চালু করেছে। আশার সেবা গ্রহণকারী সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে 'একটি স্বাস্থ্য সমস্যা ও তা নিরাময়ে' সদস্যদের গ্রুপে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে ১২ মাসে ১২টি রোগের প্রতিরোধ ও সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রায় ৬৮ লাখ সদস্য উপকৃত হচ্ছেন। প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ সুবিধাবঞ্চিত মানুষ আশার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে। পক্ষাঘাত ও জটিল রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসায় আশা ফিজিওথেরাপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বছরে প্রায় ৭০ হাজার সেবা প্রত্যাশীকে ফিজিওথেরাপি দেয়া হচ্ছে, যাদের অধিকাংশই নারী। গ্রামীণ জনপদে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আশা স্যানিটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বছরে প্রায় লক্ষাধিক পরিবার এ কর্মসূচির সুফল ভোগ করছে। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

দেশের সার্বিক শিক্ষা উন্নয়নে আশা প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি চালু করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৪,৮০,০০০ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে পাঠ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। অনুন্নত জনপদে ১৫,২০০ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বাড়ির পাঠ তৈরিতে সহায়তা দেয়া হয়। সপ্তাহে ৬দিন স্কুল শুরুর পূর্বে অথবা পরে ২ ঘণ্টা করে শিক্ষা দেয়া হয়; ফলে ঝরে পড়া রোধে এই কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া 'আশা শিক্ষা বৃত্তি ২০১৯' চালু করেছে। চলতি বছরে এসএসসি ও এইচএসসিতে ১৭৫৮ জন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা করে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

কৃষি খাতের উন্নয়নে আশা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে আশা বেশ কিছু কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কৃষি যন্ত্রাংশ ক্রয়, শংকর জাতের গাভী পালন, মৎস্য চাষ, মাশরুম চাষ, কাঁকড়া চাষ, জৈব সার উৎপাদন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

আশা ইউনিভার্সিটি

উচ্চশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আশা প্রতিষ্ঠিত 'আশা ইউনিভার্সিটি' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রতিবছর প্রায় ৩৫০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে এখানে ভর্তি হবার সুযোগ পায়; যারা মূলত: নিম্নবিত্ত ও অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। গত ১০ বছরে আশা ইউনিভার্সিটি প্রায় ২০ কোটি টাকা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও পাঠ ফি রেয়াত দিয়েছে। আশা মেডিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও নার্সিং শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।■

দুস্থ মায়েদের বন্ধু ডর্প এর প্রতিষ্ঠাতা এএইচএম নোমান

ফেরদৌস সালাম

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যারা নিরলসভাবে অবদান রেখে চলেছেন তাঁদেরই একজন দেশখ্যাত এনজিও 'ডর্প' এর প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব এএইচএম নোমান। দারিদ্র্য নিরসন ও মানবহিতৈষী কাজে অবদান রাখার জন্য তিনি 'গুসি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার-২০১৩' লাভ করেছেন। এ পুরস্কার ও লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিনিই প্রথম। ফিলিপিনসভিত্তিক গুসি ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্যে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। তিনি জেসিআই শান্তি পুরস্কার-২০১৭ লাভ করেছেন। সমাজ কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদার আকাশ পত্রিকা ও প্রকাশন থেকে গত ২ জানুয়ারি ২০২০ এএইচএম নোমান 'প্রচারহীন বীরত্ব' সম্মাননা লাভ করেন।

মানবিক উন্নয়নের আলোকিত ব্যক্তিত্ব এএইচএম নোমান এর জন্ম ১৯৪৭ সালে ভোলার দৌলতখান উপজেলার হাজীপুর গ্রামে। পরবর্তীতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর আলেকজান্ডারে বসবাস, শিক্ষা ও কর্মজীবন শুরু করেন। তার বাবা প্রয়াত ডা. মফিজুর রহমান এবং মা প্রয়াত শামছুন্নাহার।

তিনি ১৯৬৬ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে বিকম এবং সিএ ফার্ম 'এ কাশেম অ্যান্ড কোম্পানি' থেকে ১৯৬৯ সালে সিএ কোর্স সমাপ্ত করেন।

এএইচএম নোমান ছেলেবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ লোকের প্রাণহানিতে 'ধ্বংস থেকে সৃষ্টি'র স্লোগান নিয়ে রামগতি তথা বৃহত্তর নোয়াখালীতে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রামগতি থানা কেন্দ্রীয় সমবায়ের (বিআরডিবি) মাধ্যমে 'বিশ্বগ্রাম' এর প্রতিষ্ঠাতা ও বাস্তবায়নকারী। 'স্বনির্ভর আন্দোলন' তথা স্বনির্ভর বাংলাদেশ-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে 'ঢেঁকি ঋণ' চালুর অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি।

মানবকল্যাণে নিবেদিত এএইচএম নোমান অনেক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি কোস্টাল কিসারকোক কমিউনিটি নেটওয়ার্ক-কফকন এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল সেক্রেটারি ও পিপলস্ হেলথ মুভমেন্ট পিএইচএম বাংলাদেশ সার্কেল এর প্রথম চেয়ারপারসন, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ এফএনবি'র নির্বাচিত সহ-সভাপতি এবং উন্নয়ন ও মানবাধিকার নেটওয়ার্ক সংস্থা বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ 'বামাসপ' এর সাবেক সভাপতি। এ ছাড়া তিনি নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। তিনি সাহিত্য সংগঠন 'বৃহস্পতির আড্ডা'র পৃষ্ঠপোষক।

ডর্প-এর সাফল্য

সুশাসন, মানবাধিকার, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, পুনর্বাসন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ডর্প। জন্মলগ্ন থেকে এটি তৃণমূল পর্যায়ে ও উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। বর্তমানে ২৮টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৫ সালে ডর্প 'মাতৃত্বকালীন ভাতা' প্রবর্তন করে যা ২০০৭ সাল থেকে সরকার কর্তৃক সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মায়েদের কেন্দ্র করে ডর্প বাস্তবায়িত 'স্বপ্ন প্যাকেজ' কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক সফলতা এনেছে। এ কার্যক্রমটিও ইতোমধ্যে সরকার সাতটি বিভাগের ১০টি উপজেলায় পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করেছে। এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় ইতোমধ্যে তিনি 'মাতৃবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। 'স্বাস্থ্যগ্রাম' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় ডর্প সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি চ্যান্সেলর্স অ্যাওয়ার্ড ২০০৬ এবং জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম ইউনিট থেকে 'ওয়াটার ফর লাইফ বেস্ট প্রাকটিসেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৩' লাভ করেছে।

ডরপ এর গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ যোবায়ের

হাসান ২০০টির অধিক পার্টনারশিপ বিষয়ক প্লাটফর্ম 'স্যানিটেশন অ্যান্ড ওয়াটার ফর অল' স্টিয়ারিং কমিটির সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের পক্ষে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

প্রত্যয়-এর সাথে আলাপচারিতায় এএইচএম নোমান

ডর্প-এর প্রতিষ্ঠাতা এএইচএম নোমান দেশের আবহমানকালের দরিদ্র-অসহায় ও অবহেলিত নারীর পাশে দাঁড়িয়ে এক ভিন্নতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। 'প্রত্যয়'র সাথে একান্ত আলাপচারিতায় এএইচএম নোমান বলেন, 'মাতৃত্বকালীন ভাতা' উদ্যোগটি আমার জন্যে আল্লাহর এক অনন্য অবদান। না হলে পুরুষ হয়ে নারীদের প্রসব ব্যথা নিয়ে আমার মতো অখ্যাত লোক দিয়ে এই উদ্যোগ হবে কেন?

তিনি আরো বলেন, সরকারি-বেসরকারি চাকরিরত নারীরা গর্ভকালীন সময়ে সবেতন ছুটি পান, কিন্তু দেশের অসংখ্য নারী যাদের সামর্থ্য নেই, অসহায়-দরিদ্র তারা কোনো সুযোগই পান না–এই বিষয়টি চিন্তা করেই আমি 'ডর্প' এর মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেই। আল্লাহর অপার ইচ্ছায়, এখন এটি সারাদেশে সরকারি কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে এএইচএম নোমান বলেন, আমি মনে করি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একজন 'স্বপ্ন-মা রাণী'। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন দৃঢ়চেতা, দূরদর্শী, প্রত্যয়ী, মানবদরদী সাহসী নারী। যিনি দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণাই দেননি বরং তা সমাপ্তির পথে। তিনি এ দেশকে অনেক উচ্চতায় নিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

'স্বপ্ন মা' সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন মা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একজন মা অর্থনীতিবিদ–যিনি সংসার চালান, বেস্ট ম্যানেজার–স্বাস্থ্য ম্যানেজার, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রায় প্রতিটি মাকেই এই দায়িত্বগুলো পালন করতে হচ্ছে। তাঁদেরকে উপেক্ষা করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বটম লাইনিং মাকে কেন্দ্র করেই উন্নয়ন কর্মসূচি নিতে হবে। এটি শুধু শিক্ষা, বাসস্থান কিংবা কৃষি নয়, সকল ক্ষেত্রেই। এ জন্যে মায়েদের সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণের সাফল্যও এসেছে এই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উদ্যোগী মনোভাবের ফলে। নারীরা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী, পরিশ্রমী ও স্বপ্নদর্শী। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষায়ও বদ্ধপরিকর। ফলে ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের হার প্রায় শতভাগ।

প্রত্যয় এর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে এএইচএম নোমান বলেন, এ দেশে ক্ষুদ্রঋণের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমের কারণেই দেশ আজ স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় ক্ষুদ্রঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।■

জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োজন বৈষম্যহীন সমাজ

আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঘাসফুল

সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস সালাম | বিদ্যুত খোশনবীশ

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সমাজকর্মী মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ দেশের অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে পারিবারিক সদস্য ও নিকটাত্মীয়দের সহায়তায় গঠন করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল'। তিনি দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতীক হিসেবে সংগঠনটির নাম দেন 'ঘাসফুল'। প্রকৃতিতে ঘাসফুল যেমন ফুল হয়ে ফুটলেও ফুলের মর্যাদা পায় না, নির্বিচারে, অকারণে পদদলিত হয় তেমনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল মানুষগুলো মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও মানুষের মর্যাদা পায় না। ঘাসফুল এসকল তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করে চট্টগ্রাম শহরে রিলিফ ওয়ার্কের মাধ্যমে। ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং ২০০৪ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ১২৬তম বোর্ড সভায় ঘাসফুল সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯৭ সালে ঘাসফুল দাতা সংস্থা অ্যাকশন-এইড এর সহায়তায় দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন-মান উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ঘাসফুল পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ এবং চাপাঁইনবাবগঞ্জসহ ছয়টি জেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী, কিশোর-কিশোরী, শিশুসহ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও আত্মচালিত করার মাধ্যমে সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনসহ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র বিমোচন ও নারীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশু সুরক্ষা, মানবপাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

মূলত মানুষের জীবনব্যাপী জালের মতো জড়িয়ে আছে ঘাসফুল এর উন্নয়ন কার্যক্রম। সংস্থার নানা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর দাফন-কাফন কিংবা সৎকার পর্যন্ত।

আফতাবুর রহমান জাফরী বর্তমানে ঘাসফুল এর প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা। তিনি ২০০৩ সালে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদান করলেও ১৯৭২ সালে ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠালগ্নে গঠিত কমিটির সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসহ উন্নয়ন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি জেলা শিশুশ্রম মনিটরিং কমিটির সদস্য, সিডিএফ ও এফএনবি এর বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল এর আজীবন সদস্য। সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রত্যয়ের মুখোমুখি হয়েছেন আফতাবুর রহমান জাফরী, এখানে তা উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : জনাব জাফরী সংস্থার প্রধান প্রধান চলমান কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আফতাবুর রহমান জাফরী : চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এই ৬টি জেলার ৫৫টি শাখার মাধ্যমে ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে রয়েছে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র। এছাড়া রয়েছে অভিভাবক সচেতনতা সৃষ্টি ও কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতামূলক সভা। ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর মাধ্যমে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষামুখী করছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় (আশার আলো শিশু শিক্ষণ কেন্দ্র) ১৪২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল।

প্রত্যয় : স্বাস্থ্য বিষয়ে আপনারা কি কি কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন?

আফতাবুর রহমান জাফরী : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রয়েছে কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্লিনিক) ক্লিনিক্যাল সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ প্রসব, গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা ও হেলথ কার্ড। হাটহাজারী উপজেলায় রয়েছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র, শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সহায়তা, কৃষি বিষয়ক তথ্য সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সহায়তা। চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় রয়েছে জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচি (এনডিবিএমপি)।

ঘাসফুল এর অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ইমপ্রুভ কুক স্টোভ (আইসিএস), পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, ঘাসফুল ভিশন সেন্টার এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্যানিটেশন বিষয়ে

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রতিষ্ঠাতা

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম, যৌতুক ও নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি, নিরাপদ খাদ্য-পানি ও পরিবার পরিকল্পনা, মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ঘাসফুল অবদান রাখছে। রিং, কালভার্ট, ড্রেন নির্মাণ, কবর স্থান, রাস্তার পার্শ্ব ও পুকুর পাড়ের সাইড ওয়াল নির্মাণ, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দিচ্ছে ঘাসফুল। তাদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ভিক্ষুক পুনর্বাসন এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ঘাসফুল এর ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ও জীবনমান উন্নয়ন ঋণ।

হাটহাজারী উপজেলার ২টি ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও ঘাসফুল বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন ভাতা প্রদান, বিশেষ সহায়তা প্রদান (চাদর, কম্বল, লাঠি, ছাতা, কমোড চেয়ার ও হুইল চেয়ার) অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ পোষণ, দাফন-কাফন ও সৎকার এর জন্য সহায়তা প্রদান, প্রবীণ সম্মাননা প্রদান, শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, ফিজিওথেরাপি।

প্রত্যয় : কৃষিখাতে আপনাদের উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

আফতাবুর রহমান জাফরী : হাটহাজারী উপজেলায় নিরাপদ সবজি ও মশলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (পেইজ প্রকল্প) হাতে নিয়েছে ঘাসফুল। এর মধ্যে রয়েছে ভাসমান পদ্ধতিতে বেডে নিরাপদ সবজি চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে হাটহাজারীর মরিচ, গোল মরিচ চাষ। উদ্যোক্তা পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের ফল চাষ সম্প্রসারণ (ড্রাগন, এভোক্যাডো, হাইব্রিড নারিকেল, কফি ও বারহি খেজুর), হাটহাজারীর স্থানীয় মিষ্টি লাল মরিচ জাতীয় পর্যায়ে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রত্যয় : তরুণদের মানসিক উন্নয়ন বিকাশে আপনারা কিছু করছেন কি?

আফতাবুর রহমান জাফরী : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত ১২টি ওয়ার্ডে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট থ্রু এনহেনসিং প্রগ্রেসিভ স্কিল প্রগ্রেসিভ স্কিল অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি প্রজেক্ট চালু রয়েছে। যেখানে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রভাবক সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও চিহ্নিতকরণ শীর্ষক তারুণ্যভিত্তিক সমার্থক কার্যক্রম, যুব ভিত্তিক গ্রুপ/দল গঠন/ফোরাম গঠন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি। ঘাসফুল শিশু ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় ৩,৬২০ জন শিশুর হিসাব খোলা হয়েছে।

প্রত্যয় : ঘাসফুল আপনার মায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। একে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান?

আফতাবুর রহমান জাফরী : আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল বৈষম্যহীন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই স্বপ্ন নিয়েই তিনি ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে আমাদের অবস্থান থেকে আমরা নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ জন্যে আমরা সামাজিক ভ্যালুজগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করছি। এ জন্যে পরগাছা জীবনের মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

প্রত্যয় : এ দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনি কতোটা আশাবাদী?

আফতাবুর রহমান জাফরী : আমি আশাবাদী মানুষ। বর্তমানে মিডল ক্লাসের সংখ্যা বাড়ছে। এই সংখ্যা যতো বাড়বে, অর্থনীতি ততো মজবুত হবে, শিল্পায়ন হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে।■

দেশে বেকার ভাতা ও সর্বজনীন পেনশন চালু করা উচিত

আরিফুর রহমান, চীফ এক্সিকিউটিভ, ইপসা

সাক্ষাৎকার : **ফেরদৌস সালাম | বিদ্যুত খোশনবীশ**

দেশের প্রতিষ্ঠিত এনজিও চট্টগ্রামের YPSA-র শুরু ১৯৮৫ সালে। এ সালটি ছিল আন্তর্জাতিক যুববর্ষ। যুববর্ষ পালন করতে গিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মহাদেবপুরের সন্তান তরুণ আরিফুর রহমান উপলব্ধি করলেন জাতীয় উন্নয়নে তরুণরা এক বিশাল শক্তি। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ১৪ জন তরুণকে সংগঠিত করে ১৯৮৫ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন ও সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। এর মধ্যে রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী প্রচারণা অন্যতম। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ভয়াবহ সাইক্লোনে তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশ নেন। এ পর্যায়ে তারা বৃহত্তর কার্যক্রমে অংশ নেয়ার ইচ্ছা থেকে প্রতিষ্ঠা করেন Young Power in Social Action সংক্ষেপে YPSA।

আরিফুর রহমান এ প্রতিষ্ঠানটির চিফ এক্সিকিউটিভ হিসেবে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসএস ডিগ্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ইন গভর্ন্যান্স স্টাডিজ বিষয়ে থিসিস করেছেন। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির পিএইচডি রিসার্চ স্কলার। এমএফআই প্রতিষ্ঠান হিসেবে YPSA বর্তমানে ১১টি জেলায় ৫৭টি শাখার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

YPSA'র ভিশন হচ্ছে এমন এক দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার নিশ্চিত হবে। মূলত, YPSA দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তাদের নিজেদের ও সমাজের টেকসই উন্নয়ন করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। YPSA স্বদেশপ্রেম, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

YPSA যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো হচ্ছে– Health, Economic Empowerment, Human Rights and Good Governance, Education, Environment, Climate Change and Disaster Management ইত্যাদি। বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

YPSA'র Chief Executive বিশিষ্ট উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব আরিফুর রহমান 'প্রত্যয়'কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন–

প্রত্যয় : অনেকেই বলেন, সরকারই যেখানে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেখানে এনজিও এবং এমএফআই-এর প্রয়োজনীয়তা নেই, আপনার বক্তব্য কি?

আরিফুর রহমান : অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এদেশে এনজিওরা প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের আজ যে উন্নয়ন ঘটেছে এর পেছনে এনজিওদের বিশাল অবদান রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসনসহ জাতীয় উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা কাজ করছি। আমরা সরকারের উন্নয়ন টার্গেটের সহযোগী শক্তি। বর্তমানে সরকার জাতিসংঘের এসডিজি'র যে ১৭টি গোল পূরণের উদ্যোগ ও কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে দেশের এনজিও সেক্টর ১৫টি গোল পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী অতি দ্রুত বাংলাদেশ এসডিজি'র ক্ষেত্রে সফল হবে। সরকারের ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক সহায়তা করছি।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন এনজিও সেক্টরের জন্য একটি মুখপত্র প্রয়োজন?

আরিফুর রহমান : আমি অবশ্যই মনে করি এনজিও সেক্টরের জন্যে 'প্রত্যয়'-এর মতো একটি জ্ঞানভিত্তিক মুখপত্র প্রয়োজন।

প্রত্যয় : সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও দেশে দুর্নীতির হার বাড়ছে বলে অনেকেরই অভিযোগ। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

আরিফুর রহমান : দায়িত্ব পালন ও কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করতে পারার ব্যর্থতাতেই এই দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আমি মনে করি বেকারভাতা চালুসহ সর্বজনীন পেনশন সিস্টেম চালু করা উচিত। এতে নাগরিকরা একটা সিকিউরিটি অনুভব করবে। এখন একজন লোক পেশাজীবনে দুর্নীতি করে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু যদি সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু হয় তখন আর কেউ দুর্নীতি করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।■

আমার বাল্যকাল

জাকির হোসেন

টাঙ্গাইল তখন মহকুমা শহর। আয়তনে ছোট হলেও নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল এ শহর। শহরের মাঝখান দিয়ে স্রোতস্বীনি খাল ছিল। শহরের কয়েকটি মহল্লার মধ্যে কলেজপাড়া ছিল অন্যতম। এই কলেজপাড়ারই আমঘাট রোডের পৈতৃক বাসায় আমার জন্ম। আমার বাবা চাঁন মিয়া বেকারি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। সে সময় খুব কম মুসলমান বাঙালিই ব্যবসা-বাণিজ্য, ফ্যাক্টরির সাথে জড়িত ছিলেন। বাবাকে নিয়ে এখনও গর্ববোধ করি। তিনি তার সময়কালের অগ্রসরমান একজন মানুষ ছিলেন। টাঙ্গাইলে তখন তিনটি বেকারি ফ্যাক্টরি ছিল। বারু মিয়ার বেকারি, চাঁন মিয়ার (আমার বাবা) ও কালু মিয়ার বেকারি যেটা আগে বারু চাচা চালাতেন। পরে তার আত্মীয় কালু মিয়ার কাছে হস্তান্তর করেন। আরো পরে খলিল মিয়া বেকারি খোলেন। তখন এ সকল বেকারিতে বিভিন্ন ধরনের রুটি বিস্কুট তৈরি হতো। অনেকগুলো বিস্কুট হতো সাধারণ যেমন- কলা বিস্কুট, টোবা বিস্কুট, কটকটি, বনরুটি ইত্যাদি। এ ছাড়াও অনেক ধরনের মিষ্টি কনফেকশনারি বিস্কুট তৈরি হতো। যেমন- চাঁন বিস্কুট, মিষ্টি কটকটি, চিনি টোস্ট, বাকরখানি, মকরম, ভালো টোস্ট ও ভালো মানের পাউরুটি। যেগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল। ছোট্ট শহর আমাদের– প্রায় সব মানুষ একে অন্যের চেনা। আমাদের বাসা ছিল রাস্তার পাশে আমঘাট রোডের দক্ষিণ পাশে। সামনে দোকান (শো-রুম) ভেতরে রুটি বিস্কুটের ফ্যাক্টরি ও আরও ভেতরে বিশাল আলমারি– রুটি বিস্কুট বানিয়ে (কাঁচা) রাখতে হতো ফোলানোর জন্য। এরপর বড় তন্দুর বা চুলো। রুটি বিস্কুট, টোস্ট বানিয়ে কয়েক ঘন্টা আলমারিতে রেখে নির্দিষ্ট সময়ের পর লাকড়ি পুড়ে চুলো গরম হলে লম্বা বৈঠার মত কাঠের তৈরি হাতা দিয়ে টিনের পাতায় রাখা রুটি বিস্কুট ছেকার জন্য দিলে তা নির্দিষ্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিয়ে বের হতো। প্রথমবার তৈরি হতে দশ মিনিট লাগলেও দ্বিতীয়বার রুটি বিস্কুট পাকতে অনেক সময় ২৫-৩০ মিনিট লাগতো। কিছু বিস্কুট ছিল মচমচে করার জন্য দ্বিতীয় বারের জন্য চুলায় দিতে হতো এক ঘন্টার জন্য। যত সময় যেতো চুলার তাপ কমে আসতো, যদিও চুলার মুখে তাপ সংরক্ষণের জন্য একটা স্টিলের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। তবুও আস্তে আস্তে তাপ কমে আসতো। পুনরায় কিছু নতুন বসাতে হলে আবার লাকড়ি সাজিয়ে জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হতো। ধোঁয়া বেরোনোর জন্য একটা বড় চিমনি চুলোর সামনের দিকে ছিল। কয়েকজন কর্মচারি সবসময় রুটি বিস্কুট তৈরি ও বিক্রির কাজ করতো। পাশের ঘরের অন্য অংশ ও ভেতরের কামড়ায় মা, বাবা ও আমি রাত্রি যাপন করতাম। তখন কিন্তু এসব খাদ্য সামগ্রী ছিল সম্পূর্ণ ভেজাল মুক্ত। তখনকার উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজালের কথা চিন্তাও করতেন না।

আমার প্রথম স্কুল

যখন থেকে কিছুটা বুঝতে শুরু করেছি বয়স তখন ৪-৫ বছর, বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে অনেক আদর ও তীক্ষ্ণ খবরদারিতে আমার বেড়ে উঠা। টাঙ্গাইল টাউন প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পাঠ শুরু। তখন প্লে গ্রুপ বলে কিছু ছিল না, বাসায় কচিকথার মাধ্যমে অক্ষর চেনার পরই স্কুলে যাওয়া।

প্রথমদিকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠদানের বিষয় মনে পড়ে, অংক শেখার জন্য আমাদের বকুলের বিচি গণনা করতে দিতো। একবার এক ক্লাস টিচার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, একটা গাছে এগারটা বক বসে আছে, একটাকে এয়ারগান দিয়ে গুলি করে মারলে কয়টা বক গাছে থাকবে। আমি তাৎক্ষণিক উত্তরে বলেছিলাম, দশটা থাকবে। সেদিন টিচার অনেক হেসেছিলেন। পরে ক্লাসের ছেলে মেয়েরাও একচোট হেসেছিল আমার বোকামি দেখে। পরে আমি যখন বুঝলাম একটাকে গুলি করলে বাকিরা সবাই ভয়ে উড়ে চলে যাবে, গাছে কোনো বক অবশিষ্ট থাকবে না। এরকম বোঝার বয়স তখনও হয়নি। যখন বুঝলাম, বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম। দু'দিন স্কুলে যাইনি, পরে মা'র

চাপাচাপিতে দু'দিন পর বাবা আমাকে স্কুলে দিয়ে এসেছিলেন। একমাত্র সন্তান বলেই হয়তো বাবা-মার স্নেহ খুব বেশিই পেয়েছি। বাবার আপাত্য স্নেহ আমাকে বড় হবার ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। তিনি যেমন ছিলেন কড়া অভিভাবক, তেমনি ছিলেন বন্ধুর মত। কখনও হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে বুঝতাম ব্যথাটা আমার চেয়ে তিনিই বেশি পেয়েছেন। বাবা তার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে নিয়ে সময় কাটিয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করতেন। বাবা ছিলেন বেশ আমুদে। নিয়মিত স্কুলে যাই বাবার কাঁধে চড়ে, বেড়াতে যাই- নদী পাড়ের মাঠে।

ঘোড়ার গাড়ি টমটম

মনে পড়ে দিঘুলিয়া থেকে যে রাস্তাটি মেইন রোড ক্রস করে পাঁচআনী, ছয়আনী বাজারে গিয়েছে সেটি ছিল মাটির রাস্তা। গাড়ি বলতে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, পরে দু'একটা করে রিকশা আমদানি হতে থাকে। মেইন রাস্তাটি ছিল শান্তিকুঞ্জ থেকে আকুর টাকুর পাড়া বটতলা পর্যন্ত অপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। নিরালার মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড হয়ে যেটা ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডে মিশেছে। এছাড়া টাঙ্গাইলের এই ছোট্ট শহরটায় কোনো পাকা রাস্তা ছিল না। নিরালার মোড়, কালীবাড়ির মোড় ও বাকা মিয়ার বাসার কাছে খালের উপর তিনটি ছোট ব্রিজ ছিল। রাস্তার ধার দিয়ে খালটি ছিল চমৎকার। বর্ষাকালে ওটা প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে বেতকার পাশ দিয়ে যাওয়া নদীতে গিয়ে পরতো। ভিক্টোরিয়া রোডে সাবেক আপ্যায়ন রেস্টুরেন্টের সামনে এক বিরাট বটগাছ (কিংবা পাকৈর গাছ) ছিল। গাছের নিচে ছিল ঘোড়ার গাড়ীর স্ট্যান্ড। দূরে যারা যাতায়াত করতো, ওখান থেকেই ঘোড়ার গাড়ি টমটমে করে যেতে হতো। ছেলেবেলায় অনেকবার বাবা-মা'র সাথে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে লাউহাটি অথবা গালার পশ্চিমে ফৈলার ঘোনা আমার খালাতো বোনের ওখানে যেতাম আম-কাঠালের দিনে অথবা শীতে পিঠা খাওয়ার সময়। লাউহাটি ছিল মায়ের মামাবাড়ি। ওখানেও অনেকবার যাওয়া হয়েছে। লাউহাটিতে যতবার গেছি ওখানে গ্রামের পাশের নদীতে স্নান করতে যেতে হতো। ছেলেবেলায় খেলতে যেতাম বাসার পেছনে মুসলিম ইনিস্টিটিউটের মাঠে। বিকেলে সিনিয়র জুনিয়র সবাই মিলে ছেলে মেয়েরা গোল্লাছুট, সাতচারা কিংবা কিং কিং খেলতাম। পাড়ার বন্ধুদের বড় বোনেরাও আমাদের সাথে খেলতে আসতো। সে সময় ফাতেমা আপা, আলকুমা আপা, হেনা আপা, হাজেরা আপা, লুলু আপা ও মলি আপা মাঠে খেলতে আসতো। আমরা প্রাইমারিতে পড়লেও ওনারা তখন সিক্স-সেভেনে পড়তেন। সেলিম ও ওর ছোটভাই হেলিম মাদ্রাসা পট্টি থেকে খেলতে আসতো। মুসলিম ইনস্টিটিউটের মাঠ জমিদারদের মাঠের সাথে একাকার ছিল। জমিদারদের (মহব্বত আলী চৌধুরী দেলদুয়ারের জমিদার) আম, লিচু, জামরুল ও দুধ জামের বাগান ছিল। গাছের ছায়ায় আমরা ছুটিরদিনে লুডু খেলতাম। ঝড়ের দিনে আম কুড়াতাম। পাকা আম বাতাসে ঝড়ে পড়লে না ধুয়েই মাথায় কামড়ে ফুটো করে চুষে চুষে খাওয়া খুবই মজার ব্যাপার ছিল। মাঠের কিছু অংশে ছিল দণ্ড কলস, আকন্দ ও অনেক ধরনের আগাছা। দণ্ড কলস, আকন্দ গাছে ফুল ফুটলে মধু খেতে মৌমাছি আসতো বিভিন্ন ধরনের। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চমৎকার ফড়িং আসতো– সাদা, কালো বিভিন্ন রঙের ফড়িং, প্রজাপতি, বাঘা ফড়িং। আমরা শোলার স্টিকে জিগা গাছের আঠা লাগিয়ে ফড়িং বিশেষ করে বাঘা ফড়িং এর পাখা আটকে ধরে ফেলতাম, এরপর গুটি সুতো বেধে ঘুড়ির মত ফড়িং উড়াতাম। সুতোর বাঁধনের কারণে ফড়িং অনেক সময় লেজ ছিড়ে উড়ে চলে যেত অথবা মরে যেতো। ফড়িং মারা গেলে তখন মনে হতো কাজটা ভাল হয়নি। কিন্তু দু-একদিন পর আবার ফড়িং এর পেছনে ছুটতাম...।

শিশুবেলার বর্ষাকাল

বর্ষাকাল এলে বাকুদের বাসার ড্রেন দিয়ে আস্তে আস্তে বানের পানি আসতো। প্রতিদিন সকালে গিয়ে মেপে দেখতাম, ইটের টুকরো দিয়ে ড্রেনের ওয়ালে পানির লেভেলে দাগ দিয়ে রাখতাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে ড্রেনের পানি বেড়েছে কিনা, কতটা বেড়েছে দেখতে যেতাম। সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিল কতটা পানি হয়েছে তা দেখা। ধীরে ধীরে পানি বেড়ে তা রাস্তায় উঠতো। যত পানি বাড়তো ততই পুলক অনুভব করতাম, চাইতাম বন্যা হয়ে রাস্তা প্লাবিত হোক। পানি হলে দিঘুলিয়া-সাকরাইলের লোকজন নৌকায় করে বাজারে বা শহরে আসতো। ফসল বা পণ্য সামগ্রী নিয়ে আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে নৌকায় মালামাল নিয়ে আসতো। অনেকে চাল, ডাল আটাসহ পণ্য সামগ্রী বাজার থেকে কিনে গ্রামে নিয়ে যেতো। সে সময় প্রায় প্রতি বছরই এ রকম বন্যা হতো। আমরা কিশোররা ঐ সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। ৭-১০ দিন পানি থাকতো। এরপর প্রতিদিন পানি কমে রাস্তা থেকে নেমে যেত। ড্রেনে বেশ কিছুদিন পানি থাকতো। আমরা ছোট ছিপ দিয়ে ময়ূরের পাখার টোন লাগিয়ে পাউরুটি ভিজিয়ে মাছ ধরতাম। প্রতি টানেই পুঁটি মাছ ও ছোট ছোট কই মাছ ধরা পড়তো। ২০-২৫ টা ধরে বাসায় নিলে মা দুপুরে খাবার সময় কড়া করে ভেজে দিলে মজা করে খেতাম। বন্যার সময় দোকানের কর্মচারীদের দিয়ে কলাগাছ কেটে ভেলা বানাতাম। ছোট বাঁশের লগি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভেলায় চড়ে ঘুরতে পারতাম।

একবার ১৯৬২ সালে অনেক পানি হয়েছিল। সেবার শহরে গ্রাম থেকে অনেক কোষা নৌকা এসেছিল, ভাড়ায় খাটতো সেগুলো। মানুষজন প্রয়োজনে একপাড়া থেকে আরেকপাড়া পয়সার বিনিময়ে যাতায়াত করতো। সেবার রেজিস্ট্রিপাড়ায় কতটা পানি হয়েছে নৌকায় চড়ে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের বাসা থেকে এক মহল্লা দূরে দক্ষিণ দিকে নিষিদ্ধপল্লীর সামনে একটা পুকুর ছিল। কলাগাছের ভেলা নিয়ে আমরা কয়েকজন– জালাল, মজিবর (গ্যাদা) ও আমি ঐ পুকুরে গিয়েছিলাম। পুকুরের ধারে একটা বড় আমগাছ ছিল। আমরা ওটার মগডালে উঠে পুকুরে লাফিয়ে পড়তাম। এরকম বন্যার পানি শহরে এলে আমরা কিশোররা ভীষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

এক বালতি ইয়ার্কি

গ্রীষ্মকালে আমরা পদ্মমনি পুকুর (বড় পুকুর), পার্কের পুকুর, কলেজপাড়া রেনু সাহার পুকুরে গোসল করতাম এবং প্রায় সব সময়ই লাফিয়ে নামতাম পুকুরে এবং সাঁতার কাটতাম। প্রথম প্রথম পুকুরে হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে অল্প বয়সেই সাঁতার কাটা আমার আয়ত্তে চলে আসে। বিন্দুবাসিনী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুলের পেছনের খালে পানি আসতো। আমরা ছুটির দিনে অথবা স্কুল ছুটি হলেই পেছনের ব্রিজ থেকে অথবা পার্কের বড় গাছের মগডাল থেকে স্রোতস্বিনী টইটুম্বুর খালে লাফিয়ে পড়তাম। স্রোতের টানে কিছুদূর সাঁতরে আবার উঠে লাফিয়ে পরতাম। এভাবে অনেক সময় পানিতে থেকে যখন চোখ লাল হতো তখন বাসায় গিয়ে বাবা-মা'র বকুনি খাব এই আশঙ্কায় বাসায় ফিরতাম খুব ভয়ে। কখনো কখনো অন্যের দেখাদেখি চোখের সামনে কচুপাতা ধরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম যাতে চোখের লাল কেটে যায়, বকুনি থেকে রক্ষা পাই।

চৈত্র বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টির কারণে বাসার সামনের রাস্তা ধুলোময় হয়ে যেতো। প্রতিদিন হাজারো মানুষ এ রাস্তায় চলাচল করতো। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ায় করে মালামাল বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে গ্রামে ও শহরের পশ্চিমে চরাঞ্চলে নিয়ে যেত। গ্রাম থেকে মালামাল, শস্য বাজারে নিয়ে আসতো। সে সময় ঐ সকল গাড়ির চাকায় লোহাড় পাত লাগাতো, ঘোড়ার খুড়ে লোহার নাল পড়াতো। লোকজন ও গাড়ি চলাচলে প্রায়ই ঐ সময় এক হাঁটু পরিমাণ ধুলো জমতো রাস্তায়। লোক ও গাড়ি চলাচলের কারণে ধুলো উড়ে বাসা বাড়ি, দোকানপাট ভরে যেতো। কাপড় নোংরা হতো, রাস্তার ধারের

দোকানি ও বাসিন্দারা ঐ সময়ে সরকারি নির্দেশে দোকানে আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য লাল রং করে বালতি রাখতো দোকানে-বাসায়। পানির জন্য খুব কম টিউবওয়েল ছিল। পানির উৎস হিসেবে তখন বাসা বাড়িতে পাকা ইঁদারা বা কুয়ো ছিল। বালতিতে রশি বেঁধে সেখান থেকে জল তুলে পানীয় জল, গোসল বা স্নান, দৈনন্দিন রান্নার কাজে ব্যবহার করতো। দোকানি ও বাসিন্দারা মাঝে মাঝে দল বেধে সকাল বেলায় বালতিতে পানি এনে রাস্তায় ধুলো মারতে ঝাপিয়ে পড়তো লিপটন চাচার (এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলামের বাবা) টিউবওয়েলে। এরকম অনেক ঘটনা আমার মনে আছে।

এরকম একটা অবস্থায় অনেকদিনই রাস্তার ধুলো নিবারণের জন্য সব দোকানি ও প্রতিবেশিরা আমাদের বেকারির সকল কর্মচারিসহ বালতিতে পানি ভরে রাস্তায় ঢালতো। এতে ধুলো ওড়া দু'এক দিনের জন্য কমে যেত। বালতিতে পানি ঢালার সময় রাস্তা দিয়ে পরিচিত পথচারীদের কেউ গেলে বালতির পানি দিয়ে ভিজিয়ে মজা করতো কেউ কেউ। আমি দাঁড়িয়ে থেকে এসব অবলোকন করে খুব মজা পেতাম। দু'এক জন বিশেষ করে পরেশদা শেষ পর্যায়ে পানি ছিটানো বন্ধ করার আগে বলতো আমি আর 'এক বালতি ইয়ার্কি' করতে চাই।

চারপাশে যাদের দেখেছি

তখন মেইন রোডের কাছে রাস্তার মাথায় ছিল মঙ্গল পালদের মদের দোকান। ওর বাবা বসন্ত কুমার পাল এই ব্যবসার সাথে অনেকদিন জড়িত ছিলেন। হরিজন, মেথরসহ অনেকেই ওদের দোকান থেকে বাংলা মদ কিনে খেত। দোকানের পাশে বসেই মদ্য পানের জন্য একটা ছাপরা ঘর ছিল। ভেতর থেকে জানালা দিয়ে মদ বিক্রি করতো। অনেকে বোতল নিয়ে যেত। অনেকে বসে খেয়ে ওখানেই মাতলামি করতো– ছেলেবেলাতে এমন অনেক দেখেছি। মঙ্গল, নির্মল, বিনয়, বিসু ও পরেশ এরা ছিল বসন্ত পালের ছেলে। মেয়ে ছিল দু'জন, এক জনের নাম আলো। আমার এক ক্লাস উপরে পড়তো। ওর এক বড় বোন ছিল, তার বিয়ে হয়েছিল চাটমোহর। ওখান থেকে আলোর বোনের মেয়ে কামনা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতো। বসন্ত কুমার পালের দোকানের সামনে ছিল মুন্সির দোকান, পাশে কালিদার দোকান, মাঝে বিড়ি ফ্যাক্টরি লাল খান সাহেবদের। তার পাশে দয়াল সাহার খাওয়া ও থাকার হোটেল। ওটার পেছনে ছিল আর্টিজেন্স এর তাঁতের ফ্যাক্টরী। দয়াল সাহার ছেলে বাদল আমার বন্ধু, ওর বড় দুই ভাই বুড়া ও হরিদা ঘড়ির দোকান করতো।

আমাদের পশ্চিম পাশে আসলামদের বাসা, তারপর খন্দকার আব্দুর রৌফ চাচার অর্থাৎ রিজভী, স্বপন, ডলি আপা, মলি আপা, এলি, পলিদের বাসা। ওর পশ্চিম পাশে রাস্তার ওপারে অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাড়ি। ওনার বড় ছেলে খসরু, মতিন, মজনু, আনোয়ার (সুতু), আশানুর আলম ডেপু, নজরুল ইসলাম বাকু (পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ)। ডেপু ও বাকু দুজনেই আমার বন্ধু। ডেপু ও বাকু এক ক্লাসে পড়তো, বাকুর স্টাডি ব্রেক ছিল। বাকুদের বাসার উল্টো দিকে ডা. মকসুদ মির্জাদের বাসা। তিনি শিবনাথ হাই স্কুলের শিক্ষক টিপু মির্জার বড় ভাই। পাশেই মির্জা রৌফ, রফি, সফি, রুবা, নার্গিছ, রেবা, ফরিদা ও জগলুদের বাসা (পরবর্তীতে জগলু বাস ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে শহিদ হয়)। তার পাশে মোজাম্মেল মির্জাদের (মুজামামু) বাসা। এ মহল্লায় মির্জা পরিবারের অনেকেরই বাসা। ওনারা সবাই চর এলাকা থেকে এসে কলেজপাড়ায় বাসা করেছেন। আশরাফ মির্জা পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তার ভাই সাঈদ মির্জা। তার ছেলে মানিক ভাই, মঞ্জু, মাসুদ এরা আমার সাথে বিন্দুবাসিনিতে পড়তো। পাকিস্তান আমলে এমপিএ ছিলেন তাদের চাচা হাফিজ মির্জা। তার ছেলে রেজা ভাই ও গামার সাথেও আমার ভাল পরিচয় ছিল।

অন্যদিকে হালিম মোক্তার সাহেবের ছেলে শামছুর রহমান খান শাহজাহান, আতোয়ার রহমান খান, তাদের নিকট আত্মীয় বেবী ভাই, লিলি আপাদের বাসা। আব্দুল হামিদ বাবলু আমার সহপাঠী ছিল। বাবলুর বড় বোনের স্বামী ছিলেন সাবরেজিস্ট্রার কিসলুর বাবা। পাশের বাড়ি বাকু ও কিসলুদের বাসার মাঝখানে একিন আলী সাহেবদের বাসা। ওনার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আব্দুল হাই বড়। তাকে আমি কখনো দেখিনি। বাদশা ভাই, সুরুজ ভাই, চাঁন মিয়া- তাদের বড় বোন সাকীর মা ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া বুড়ী আপা, লুলু আপা, দিলু ও নিলু এরা ছিল একিন আলী সাহেবের ছেলে মেয়ে। প্রতিটি পরিবারেই তখন ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। শুধু আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

বারু মিয়ার ছিল পাঁচ ছেলে চার মেয়ে। বড় ছেলে জয়নাল স্কুলে পড়ার সময় নিরুদ্দেশ হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেকেই বলতো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের মধ্যেও ছেলেধরা নিয়ে আতঙ্ক কাজ করতো। এরপর বন্ধু জালাল, আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। একই রকম ড্রেস জুতো পড়ে জালালকে নিয়ে সর্বত্র ঘুরতাম। জালালের ছোট আলাউদ্দিন, তারপর আলমগীর, ওর ছোট হাসেম, বোনদের মধ্যে ফাতেমা আপা, আলকুমা আপা, পলাশী ও সায়মা। সবার সাথেই ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আমাদের নিকট প্রতিবেশী কবি, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ বুলবুল খান মাহবুবের পিতা আব্দুল করিম খান ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। লেখক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তার স্ত্রী হামিদা চৌধুরী, বড় ছেলে আতাউর রহমান খানও লেখক ছিলেন। বড় মেয়ে সোফিয়া খান ভাষাসৈনিক হিসেবে স্বীকৃত। পরের বোন রোকেয়া খান শিক্ষকতা করতেন। এরপর জোসনা হক, ছোট বোন ঝর্ণা খান। বুলবুল খান মাহবুব বিয়ে করেন আমার বন্ধু সাইদুল আলম জাহাঙ্গীরের বড় বোন তাহমিনা খান রেবা আপাকে। তাদের বাসা পাশাপাশি। জাহাঙ্গীরের বাপ চাচারা তিন ভাই। খন্দকার মেজবাহ্ উদ্দিন, খন্দকার তায়েব উদ্দিন (শোভা মিয়া), খন্দকার আশরাফ উদ্দিন (খোকা মিয়া)। তিন ভাইয়ের তিনটি ছাপাখানা ছিল। ডায়মন্ড প্রেস, টাউন প্রেস ও তারা প্রেস।

এছাড়াও একটি গেস্ট হাউজ ছিল- শাহীন গেস্ট হাউজ। জাহাঙ্গীররাও বেশ কয়েকজন ভাইবোন- রেবা আপা, রানু, রেখা, ফিরোজ, রানা, রতন ও রঞ্জন। মেইন রোডে রাস্তার ওপার মতিউজ্জামান খান ও বদিউজ্জামান খান সাহেবদের বাসা। বদিউজ্জামান খান আওয়ামী লীগ নেতা ও ৭০ এর নির্বাচনে এমপিএ হন। মতিউজ্জামান খান সাহেবের বড় ছেলে আইয়ুব খান মোহসিন আমার সহপাঠী ছিল। বদিউজ্জামান খান সাহেবের দুই ছেলে উল্কা ও ঝঞ্জা ছোটবেলা থেকে আমাকে মামা সম্বোধন করতো। আমার শিশু বেলাকার চারপাশের এরকম সবার পরিচয় দিতে গেলে লেখার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই অন্য প্রসঙ্গে যাই।

বই পড়ার আগ্রহ

কিশোর বয়সে আমার বই পড়ার আগ্রহ ছিল খুব। সে সময়কার ছোটদের গল্পের বইগুলো ছিলো অনেক মজার। গল্প ছাড়াও জীবজন্তুদের কাহিনী, ছোটদের সায়েন্স ফিক্শন এগুলোও আমাকে টানতো। এরকম অনেক গল্পের মধ্যে হাতেখড়ি 'শিয়ালের বৈঠকখানা' দিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সায়েন্স ফিক্সনের ছোটগল্পগুলো খুবই মজার ছিল। স্কুলের পঞ্চম ক্লাসের সময় থেকেই গল্পের বই পড়া শুরু। তখন বই পড়ার একটা চেইন ছিল। জালাল অনেক বই সংগ্রহ করতো। বিশেষ করে ফাতেমা আপা নিয়মিত বই কিনতেন, জালাল পড়ে আমাকে দিত।

এছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত বই এনে পড়ে তা ফেরত দিয়ে আবার একটা নিয়ে ফিরতাম। এভাবে বাংলা ভাষাভাষী বিশ্বের সে সময়ের প্রায় সমগ্র লেখকদের বই পড়ে ফেলেছিলাম। ভ্রমণকাহিনী, অটোবায়োগ্রাফি,

শিকার কাহিনী, উপন্যাস, রহস্য উপন্যাস, ছোট গল্পের বই, বিদেশি অনুবাদ, চায়নিজ রাজনীতির অনুবাদ, রাশিয়ান উদয়ন, কোরিয়ার বাংলা ইংরেজি, ইন্ডিয়ান পূর্বতরঙ্গ ও অনিক এসব বই ও পত্রিকা অনেক পড়েছি। ৬০ এর দশকে সেগুনবাগান প্রকাশনীর বইয়ের সাথে পরিচয় ঘটে। সম্ভবত ৬৬ তে নিয়ে এলো রহস্য পত্রিকা, কুয়াশা সিরিজ এবং কাজী আনোয়ার হোসেনের অনবদ্য সৃষ্টি স্পাই থ্রিলার, মাসুদ রানা সিরিজ, ধ্বংস পাহাড়, ভারত নাট্যম, স্বর্ণমৃগ, দুঃসাহসিক ইত্যাদি। এগুলো ছিল আমাদের জন্য অনেক মজার ও নতুন এক জগত। আমাদের মত কিশোরদের সামনে উন্মোচিত হলো নতুন দিগন্ত।

এছাড়া জিম করবেট, মারিও পুজো, আয়ান ফ্লেমিং, জুলভার্ন, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, চার্লস ডিকেন্স, এইচজি ওয়েলস, মার্ক টোয়েন, লিও টলস্টয়, হারমান মেলভিল, করম্যাক ম্যাকার্থি, ব্রাম স্টোকার, ভিক্টর হুগো, সত্যজিত রায় (ফেলুদা), ফ্রেড ভারগাম, কপ মাইগ্রেট, কেনেথ এন্ডারসনের শিকার কাহিনী, ভারতের উত্তর প্রদেশের কুমায়ুনের পটভূমিতে বিভিন্ন স্থান ও অসংখ্য সব শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী, অনেক বিদেশি গল্পের অনুবাদ সেবা'র বদৌলতে আমাদের হাতে পৌঁছে। তাই হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, এরিক মারিয়া রেমার্ক, রাফায়েল সাবাতিনি, অগাথা ক্রিস্টি, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, উইলিয়াম হাওয়ার্ড, কর্নেল কেশরী সিং, জ্যাক লন্ডন, ম্যাক্সিম গোর্কি, শেক্সপিয়ার, সের্গেই ইয়েসেনিনসহ শংকর, ডা. নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্র কুমার, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, কৃষণ চন্দর, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সা'দত হাসান মান্টো এবং বাংলাদেশে শওকত ওসমান, কাজী আনোয়ার হোসেন, রাকিব হাসান, শেখ আব্দুল হাকিম, জহির রায়হান, পচাব্দী গাজীসহ অনেকের লেখা পড়েছি, অনেক যত্ন করে।

এছাড়াও কার্ল মার্ক্স-এর ডাস ক্যাপিটাল, আলেকজান্ডার দ্যুমো, এডগার অ্যালান পো, মাও সেতুং এর সকল অনুবাদ যেগুলো লাল বই হিসেবে পাওয়া যেত। কবি মুকুন্দ দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জসিম উদ্‌দীন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, খুশবন্তসিং, অরুন্ধতি, বিভূতিভূষণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারা সংকর, শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেবগুহ, অমিত চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাসের অনেক কবিতা পড়েছি। মিরসিয়া এলিয়াদ (লা নুই বেঙ্গলী) মৈত্রেয়ী দেবী (ন'হন্যতে) শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কিরিটি সিরিজ), নীহার রঞ্জন গুপ্তসহ আরো অনেকের লেখা।

শিশুবেলায় দেখা ছবি

মাঝে মাঝে কালি সিনেমা হলে বাবার সাথে সিনেমা দেখতে যাই। তখন অনেক ভারতীয় হিন্দি বাংলা ছবি প্রদর্শিত হতো। অনেক মাদ্রাজি ছবিও হিন্দি ডাবিং হয়ে আসতো। পাকিস্তানি উর্দু ছবিও তখন জনপ্রিয় ছিল।

কিছু পূর্ব পাকিস্তানি বাংলা ছবি হতো। মাঝে মাঝে দু-একটা উর্দু ছবিও রিলিজ হতো। সাবিহা সন্তোষ, মোহম্মদ আলী, ওয়াহিদ মুরাজ জেবা, সুধীয়, দর্পণ, এজাজ, নিলো, দিবা গাজালা, তারানা, শামিম আরা কামাল, নাছিমা খান এরা জনপ্রিয় শিল্পী ছিল। পরে বাঙালিদের মধ্যে শবনম, রহমান, আজিম, নাদিম, শাবানা উর্দু ছবি করে জনপ্রিয় হয়েছিল। গানের শিল্পী হিসেবে মালা আহম্মেদ রুশদি, আইরিন পারভীন, মেহেদী হাসান, সেলিম রেজা, মাসুদ রানা, মুনির হোসেন, নুরজাহান খুবই জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও বশির আহম্মেদ অনেক জনপ্রিয় উর্দু গানের শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রুনা লায়লা পাকিস্তানে তরুণী শিল্পী হিসেবে আর নাহিদ আকতার সুশ্রী গায়িকা হিসাবে অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল। সে সময় সংগীত পরিচালক হিসাবে যারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে নিসার বাজমী, এম আশরাফ, সোহেল রানা, রবীন ঘোষ, আলী হোসেন ছিলেন অন্যতম। অনবদ্য অনেক জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা ছিলেন তারা। অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে মোহাম্মদ রফি, লতা, তালাত মাহমুদ, মুকেশ, আশা ভোষলে, গীতা দত্ত, শামসাদ বেগম ও মহেন্দ্র কাপুর অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। সংগীতকার নওশাদ, খৈয়াম, উষা খান্না, ওপি নাইয়ার, জয়দেব, মদন মোহন, রওশন, এস ডি বর্মণ, শংকর জয়কিষণ, কল্যাণজি, আনন্দজি, লক্ষীকান্ত, পেয়ারে লাল, আর ডি বর্মণ, রবি, হেমন্ত কুমার খুব ভাল কম্পোজ করতেন সে সময়। গান রচয়িতার মধ্যে সায়ের লুধিয়ানভী, রাজা মেহেদী আলী খা, সালেন্দ্র, হসরত জয়পুরী, মজরু সুলতান পুরী, আনন্দ বক্‌শী, সমীর, গুলজারসহ আরো অনেকে প্রচুর জনপ্রিয় গানের রচনা করেছেন। তখন অনেক ভারতীয় হিন্দি ও বাংলা ছবি দেখার সুযোগ হতো। শিল্পী হিসেবে দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার, রাজকাপুর, বলরাজ শাহানী, প্রদীপ কুমার, মহিপাল, আশোক কুমার মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করতেন। মেয়েদের মধ্যে মধুবালা, বৈজন্তী মালা, নিম্মি, মিনা কুমারী, নার্গিস দত্ত, নিরুপা রায়, ফরিদা জালাল, সুরাইয়া ও কামিনী কৌশলসহ অনেকেই জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ভারতীয় ছবি আসা বন্ধ হয়ে গেলে ভারতীয় ছবি দেখার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। সে সময় সুচিত্রা উত্তমের অনেক বাংলা ছবি আমরা টাঙ্গাইলের হলগুলোতে দেখেছি। ১৯৬৫'র পর ভারতীয় ছবিতে যত জনপ্রিয় শিল্পী এসেছে, গান হয়েছে সেগুলো দেখতে না পেলেও রেডিও শিলং ও বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিয়মিত শুনে শুনে চিনেছি। মনোজ কুমার, বাঙালি বিশ্বজিত সঞ্জীব কুমার, ধর্মেন্দ্র, পৃথ্বিরাজ কাপুরের ছেলে রাজ কাপুর, শাম্মি কাপুর, শশি কাপুর পরে রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, দক্ষিণের খ্যাতনামা রজনীকান্ত, নাগার্জুন ও চিরঞ্জীবি খুবই বিখ্যাত শিল্পী। এছাড়া মেয়েদের মধ্যে হেমা মালিনী, আশা পারেখ, ওয়াহিদা রহমান, রাখী, রেখা, জয়াপ্রদা, নন্দা, রাজশ্রী, লীনা চান্দ্রা ভারকার, যোগিতা বালী, শর্মিলা ঠাকুর ও হালের শ্রীদেবী উল্লেখযোগ্য। VCR আসার আগে এদের নাম জেনেছি গান শুনেছি তাদের দেখার সুযোগ পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের পর ৭২ এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বে (হালের মুম্বাই) যাওয়ার পর অনেকগুলো ছবি দেখেছিলাম।

আমার প্রিয় শিল্পী যারা

পাক-ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংগীত শিল্পীদের মধ্যে আমার অনেক প্রিয় শিল্পী ধারাবাহিকভাবে তাদের নাম লিখতে বললে প্রথম প্রিয় হলো মোহাম্মদ রফি সাহেব, এরপর পুরুষ শিল্পী কিশোর কুমার, মহেন্দ্র কাপুর, মান্না দে, মুকেশ, তালাত মাহমুদ, হেমন্ত কুমার, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র প্রমুখ। নারী শিল্পী লতা, আশা, সুমন কল্যাণপুর, গীতা দত্ত ও শামসাদ বেগম, হালের আলকা ইয়গনিক, সাধনা সরগম, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি ও শ্রেয়া ঘোষাল। হালের ছেলেদের মধ্যে শান, শানু, সনুনিগম, রাহাত ফতেহ আলী, আতিফ আসলাম প্রমুখ। এছাড়া বাংলা গানের জন্য সন্ধ্যা মুখার্জী বিশেষ প্রিয়, আরতীর কিছু গান ভাল লাগে। পাকিস্তানি শিল্পীদের মধ্যে মেহেদী হাসান, আহম্মেদ রুশদী, মাসুদ রানা, সেলিম রেজা, মুনির হোসেন, গোলাম আলী আমার প্রিয়। নারী শিল্পীদের মধ্যে মালা বেগম, নুরজাহান, আইরিন পারভিন, রুনা লায়লা, নাহিদ আকতার, নাহিদ নিয়াজী প্রমুখ। বাংলাদেশী প্রিয় শিল্পী বশির আহম্মেদ, ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমিন, জিনাত রেহেনা, আঞ্জুমান আরা, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ। পুরুষদের মধ্যে মাহমুদুন নবী, মো. আলী সিদ্দিকী, খন্দকার ফারুক আহমেদ, আনোয়ার উদ্দিন খান, আব্দুল জব্বার, পরে ফেরদৌস ওয়াহিদ ও হালের এন্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিতের অনেক গান ক্যাসেট, সিডি ও বিভিন্নভাবে আমার সংরক্ষণে রয়েছে। কর্মসুবাদে নিউইয়র্ক, লন্ডন, দুবাই, ইন্ডিয়া যেখানেই গেছি পাক-ভারতের বিভিন্ন গান সংগ্রহ করেছি। এটি ছিল আমার শখ। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের স্থানীয় জনপ্রিয় অনেক গানের সংগ্রহও রয়েছে আমার কাছে।■

● নির্বাহী পরিচালক, *বুরো বাংলাদেশ*

প্রত্যয় সাহিত্য

ছোটগল্প

ফেরা

ইসহাক খান

আমরা যাচ্ছি বাজিতপুর। আমাদের গ্রাম থেকে বাজিতপুর তিন মাইল দক্ষিণে। সেখানে একজন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা থাকেন। যুদ্ধে তিনি দু'পা হারিয়েছেন। মর্টারের সেল লেগে দুটি পা উড়ে গেছে। হুইল চেয়ারই তার একমাত্র অবলম্বন। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি আহত, নিঃসঙ্গ। তাঁর মনের জোর পাহাড় সমান। তাঁর সম্পর্কে এত কিছু শোনার পর তাকে স্বচোখে দেখবে দাউদ। তার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনবে।

দাউদ কখনও মুক্তিযোদ্ধা দেখেনি। তারা কি আমাদের মতোই মানুষ? তারা কীভাবে জীবন-যাপন করে–এসবই জানতে চায় দাউদ। দাউদের এই ধরনের আবেগী কৌতূহল ইদানিং বড় বেশি আমাকে নিয়ে টানা-হেচড়া শুরু করেছে। আগে ছিল না। উল্টো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলতো। বলতো, ভারত ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে কৌশলে রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দিয়েছে। এ সব তথ্য সে তার পারিবারিক আবহে পেয়েছে। যে কারণে ভারত দেশটি তার কাছে ভীষণ ঘৃণ্য।

একটি খালের পাড়ে এসে আমাদের যাত্রা থেমে গেল। খালটা মোটামুটি প্রশস্ত এবং গভীরও। পারাপারের জন্য খালের উপর বাঁশের একটি সাঁকো। আড়াআড়িভাবে বাঁশ পুঁতে তার উপর একটি বাঁশ লম্বাভাবে ফেলে রাখা। ধরার জন্য একটি বাঁশ বাঁধা। আমি অনায়াসে সাঁকো পার হলেও দাউদ থমকে যায়। এ ধরনের সাঁকো পার হতে আমার মতো সে অভ্যস্ত নয়। ও হাতলের বাঁশ ধরে খানিক আসার পর ওর হাত-পা কাঁপতে থাকে। আমি যত ওকে সাহস যোগাই ও ততো ভয়ে পিছিয়ে যায়।

খালের এপারে আমি ওপারে আমার চাচাতো ভাই দাউদ। দাউদ আমার বড়চাচার মেঝছেলে। বড়চাচা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর দোসর ছিলেন। শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। কথিত আছে–অনেক হিন্দু বাড়িতে তার বাহিনী লুটপাট করেছে। আরো অনেক জঘন্য কাজের সে হোতা। স্বাধীনতার পরে যুক্তরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই থিতু হয়েছেন। মোট কথা আত্মরক্ষার জন্য দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন। দাউদের জন্ম সেখানেই। এই প্রথম সে বাংলাদেশে এসেছে। আমরা দু'জন সমবয়সী। ত্রিশ ছুঁই ছুঁই আমাদের বয়স। দু'জনেরই লেখাপড়ার পাঠ শেষ। দাউদ বাংলা ভালো বলতে পারে না। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে যা বলে শুনে আমার ভীষণ মজা লাগে। আমি ওর ভাষার নাম দিয়েছি বাংলিশ।

বাংলিশ শব্দটা দাউদের ভীষণ পছন্দ। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে যাবার পর এখন সব কিছুতে ওর অপার কৌতূহল–এর মানে কি? এটা কেন হয়? এর পর কি হবে? আমি কখনও মজা করে ওর প্রশ্নের জবাব দেই। আবার কখনও সিরিয়াসভাবে গম্ভীর থাকি। আমি যা বলি দাউদ তাই বিশ্বাস করে। কিন্তু কখনও আড়ালে আমার ঠোঁটের মুচকি হাসি দেখে ওর অন্যরকম কৌতূহল হয়। আমাকে চেপে ধরে–'তুই হাসলি কেন? এই হাসির অর্থ কি?' হাসির অর্থ না জানা পর্যন্ত দাউদের প্রশ্ন শেষ হয় না।

দেশে আসার পর ওর সার্বক্ষণিক সঙ্গী আমি। আমি চোখের আড়াল হলেই দাউদ অস্থির হয়ে পড়ে। আমাকে ছাড়া ওর একদণ্ড চলে না। আমাকে নাকি ভীষণ ভাল লেগেছে ওর। আমার ভেতর নাকি অন্য একজনের সন্ধান পেয়েছে। ও বলে, 'আমি নাকি ওর চোখ খুলে দিয়েছি।'

দাউদকে আমি মজা করে ডাকি ডেভিড। আমাদের একজন পয়গম্বর ছিলেন তাঁর নাম দাউদ [আঃ]। রোমান উচ্চারণে তাকে বলে ডেভিড। শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ডেভিডের শিশু বয়সের একটি উদোম ছবি এঁকে জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দাউদ সে ছবি দেখেছে। দাউদের মুখেই আমি সে ছবির বর্ণনা শুনেছি। কিন্তু ও জানতো না সেই ডেভিডই আমাদের নবী দাউদ [আঃ]। আমি মজা করে ডেভিড বললে ও রাগ করে না। বরং হেসে আমার সঙ্গে তাল দেয়।

বার কয়েক চেষ্টার পরও দাউদ সাঁকো পার হতে ব্যর্থ হয়। আমি আবার ওর

কাছে ফিরে যাই। দাউদ এমন সাঁকো দেখে মহা ক্ষিপ্ত। বলে, 'এই অদ্ভুত জিনিসের নাম কি?'

আমি হেসে বলি, 'এর নাম ব্রিজ। বাংলার ব্রিজ।'

'ব্রিজ!' দাউদ যেন আজব কথা শুনেছে। ও হাসতে-হাসতে বসে পড়ে। 'কোন্ ইঞ্জিনিয়ার এই ব্রিজ বানিয়েছে? তাকে ধরে এনে বিচার করা উচিত।'

আমি মনে মনে হাসি। এই বাঁশের সাঁকো বানানোর জন্যে কোনো দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয় না। গ্রামের সাধারণ মানুষই এর ইঞ্জিনিয়ার। সবাই এটা তৈরি করতে পারে।

দাউদ বলে, 'এখানে একটা পাকা ব্রিজ হওয়া ভীষণ জরুরি। মানুষের কত সমস্যা। কি করে তোদের পলিটিশিয়ানরা?'

আমি ইশারায় দূরে একটি ধ্বংস হওয়া ব্রিজ দেখিয়ে বললাম, 'পাকা ব্রিজ ছিল। ক'দিন আগে একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারে ফাঁসির রায় হওয়ার পর হরতালকারীরা রাস্তা বন্ধ করার জন্য ব্রিজটা ভেঙ্গে ফেলেছে। অগত্যা গ্রামের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বাঁশ দিয়ে এই সাঁকো তৈরি করেছে।' দাউদ আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে। 'মিসক্রিয়েন্টরা ব্রিজ ধ্বংস করলো আর তোরা কেউ কিছু বললি না? দেশের আইন কি করে? তাদের ধরে ফাঁসিতে ঝোলায় না কেন?'

আমি বললাম, 'তুইতো একদিন আমাকে বলেছিলি, 'সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিরাপরাধ ইসলামপন্থিদের রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দিচ্ছে। বলিসনি?'

'তখনতো আমি এত কিছু জানতাম না। বাসায় আব্বা-আম্মা সারাদিনই এই সব কথা বলে। আমি নিজেও ফেসবুকে এই সব দেখেছি।'

'এখনও কি তাই মনে হয়?' আমার এই প্রশ্নে দাউদ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। বললাম, 'কিছু বলছিস না যে?' দাউদের বেদনার্ত কণ্ঠ ভেসে আসে, 'কি বলবো? মনে হচ্ছে দেশে না আসাটাই ভালো ছিল।'

'কেন? এ কথা বলছিস কেন?' আমি তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

দাউদ উদাস কণ্ঠে বলে, 'দেশে না এলে বাবার কদর্য অতীত জানতে পারতাম না। এতো কষ্টও পেতাম না।' দাউদের কণ্ঠ এবার সত্যি-সত্যি বাষ্পরুদ্ধ হলো। কান্না গলায় বললো, 'বিশ্বাস কর নয়ন, আমার বাপ রাজাকার ছিল এই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে–এই দেশটা আমার নয়। এই দেশের জন্য আমার পরিবারের কোনো অবদান নেই। যখনই ভাবি–আমি একজন স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারের সন্তান, তখন সব আনন্দ আমার মাটি হয়ে যায়। সব কিছু আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আমার তখন মরে যেতে ইচ্ছে করে।' দাউদ কথা শেষ করতে পারলো না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো এবং ওর সেই কান্না আমাকেও আক্রান্ত করলো। দাউদের কষ্টের চেয়ে আমার কষ্ট কম নয়। আমার বাবা সরাসরি রাজাকার ছিলেন না। কিন্তু সেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন। বড় ভাইকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা এসে বড় চাচাকে খুঁজে না পেয়ে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। আমার বাবা ছিলেন স্কুল মাষ্টার। একজন মুক্তিযোদ্ধা বাবার ছাত্র ছিল। সেই মুক্তিযোদ্ধার করুণায় বাবা ছাড়া পায়। প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু বাবা কোনোদিন সেই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি। উল্টো তাকেও জালেম বলে গালাগাল দেন। বলেন, 'ওই জালেমরাই সোনার

পাকিস্তান ভেঙ্গে দুই টুকরো করেছে। ওদের মাথায় ঠাটা পড়বে।'
ছাড়া পেয়ে বাবা অনেকদিন আত্মগোপনে ছিলেন। আমার নানার বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। পঁচাত্তরের পর কাছিমের মতো গর্ত থেকে মাথা বের করে বাড়ি ফেরেন বাবা। তারপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করলে মহানন্দে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিন্দাবাদে নেমে পড়েন।
আমাদের বাড়িটা রাজাকারের আখড়া। বাবা মুখে বলেন তিনি বিএনপি করেন–কিন্তু তিনি ভোট দেন জামায়াতে ইসলামির দাঁড়িপাল্লায়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে তাকে প্রায়শ ক্ষুব্ধ হতে দেখি। রাগ ঝেরে বলেন, 'পঞ্চাশ বছর পর আবার কিসের বিচার?' আমি একদিন বলেছিলাম, 'যারা অপরাধ করেছে তাদের বিচার হচ্ছে। তাতে আপনার সমস্যা কি?' তিনি বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। গালাগাল ঝেরে বলেন, 'গুষ্ঠিমারি ওই বিচারের। মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মতো আলেমকে বিচারের নামে ষড়যন্ত্র করে জেল খাটাচ্ছে। এর পরিণাম নেই?'
বললাম, 'বিচারকরা বলেছেন, তারা মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিচার করছেন না। তারা একাত্তর সালের দেলু রাজাকারের বিচার করছেন।' বাবা অশ্লীল ভাষায় তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বললেন, 'ওই কুত্তার বাচ্চাদের দলে তুইও ভিড়া গেছস!'
বললাম, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো বাবা? আমি কোনো দলে ভিড়ি নাই। আমি নিরপেক্ষ।'
বাবা একা একা খিস্তি করতে থাকলেন, 'মওলানা সাঈদী একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। তার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিচারের নামে ফাজলামি করছে। এখন আবার কিসের বিচার? দাড়ি-টুপি থাকলে তার বিচার করতে হবে? সব ব্যাটা নাস্তিক। এদের কোমর পর্যন্ত মাটির নিচে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে খতম করা উচিত।'
আমি দাউদকে বললাম, 'চল, আজ ফিরে যাই। কাল আবার আসবো। যেভাবেই হোক আমি একটা নৌকার ব্যবস্থা করবো। তোকে কষ্ট করে সাঁকো পার হতে হবে না।'
পরদিন আমরা বাজিতপুর সহজে পৌছে গেলাম। প্রথম চেষ্টাতেই দাউদ আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁকো পার হলো। আমি বিস্ময়ে হতবাক। এত সাহস ও কোথায় পেল? রাতারাতি কি এমন শক্তি ওর মধ্যে ভর করলো যে, ও ছুটন্ত হরিণের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে সাঁকো পার হয়ে গেল? সেই প্রশ্ন করতে দাউদ বলে, 'একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতে যাচ্ছি। আমাদেরও সাহসী না হলে চলবে?'
বাড়ি চিনতে সমস্যা হলো না। সবাই তাকে চেনে। মুক্তিযোদ্ধা বাহরাম বিশ্বাসের নাম বলতেই একজন গ্রামবাসী বললো, 'ওই যে বাহরাম বাদশার বাড়ি।'
বাহরাম বিশ্বাসকে ওই গ্রামের লোকজন বাহরাম 'বাদশা' বললো কেন–কথাটা আমাদের দু'জনকেই কৌতূহলী করে তুললো। দাউদ আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'উনি বাদশা বললেন কেন?'
বললাম, 'হয়তো ভালোবেসে বলেছে। আসলে তিনিতো বাদশাই। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে যারা বীরের মতো যুদ্ধ করে তারাতো প্রকৃত বাদশা।'
সাধারণ একটি বাড়ি। একচালা দু'টো ঘর আছে টিনের। বারান্দায় হুইল চেয়ারে বসে বাহরাম বাদশা কি যেন ভাবছিলেন। আমাদের দেখে বিস্ময়ে তাকালেন। আমরা কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে আমাদের দিকে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে তাকালেন। মাথায় ধবধবে সাদা বাবড়ি চুল। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। পেটা শরীর। যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন বোঝা যায়।
বললাম, 'আমরা পাশের গ্রাম রোহনপুর থেকে এসেছি। আমার নাম নয়ন। ওর নাম দাউদ। ও আমার চাচাতো ভাই। লন্ডনে থাকে। আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছে।'
উনি হাসলেন। বললেন, 'আমার সঙ্গে কি পরিচিত হবে? আমারতো কোনো পরিচয় নাই। গাঁয়ের লোকজন মজা করে বাদশা বলে ডাকে। মানা করলেও শোনে না। কিন্তু আমিতো বাদশা না–ফকির।'
আমি প্রতিবাদী ভঙ্গিতে বললাম, 'কে বললো আপনার পরিচয় নাই? আপনি একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই পরিচয়ের চেয়ে বড় কোনো পরিচয়, বড় কোনো সম্মান এ দেশে আছে কি? মন্ত্রী–প্রধানমন্ত্রী সব পরিচয়ই আপনার পরিচয়ের কাছে তুচ্ছ।'
দাউদ আকস্মিক প্রশ্ন করে, 'আপনি নাকি পাক আর্মিদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছিলেন? ওদের হাত থেকে বাঁচলেন কিভাবে?'
বাহরাম বাদশা হেসে বললেন, 'আমিও মাঝে-মধ্যে অবাক হই। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি–সেদিন বাঁচলাম কিভাবে?' একটু দম নিয়ে বললেন, 'সেই মুহূর্তে আমার মাথায় শুধু একটা কথাই নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, ওরা দখলদার। ওরা এসেছে আমার মাতৃভূমি দখল করতে। আর আমরা লড়াই করছি স্বাধীনতার জন্য। মাতৃভূমি দখল মুক্ত করতে। জয় আমাদের হবেই। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে এলএমজির ট্রিগার চেপে ধরলাম। মনে হলো আমার চারপাশ সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যেন শুধু আমি একা মাতৃভূমির জন্য লড়াই করছি। পাক আর্মিরা সেলিং করা শুরু করলো। কাছেই একটা সেল দ্রাম শব্দে ব্লাস্ট হলো। তারপর কি হয়েছে আমার আর মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম আমি হাসপাতালে।
দাউদের চোখ টলমল করছে। ঢোক চেপে বলে, 'আমি আপনার পা ছুঁয়ে একটু সালাম করতে চাই।'
দাউদের কণ্ঠ আবেগে বুজে আসছিল। সে আবেগ আমাকেও স্পর্শ করে। দাউদের কথায় ম্লান হাসলেন বাহরাম বাদশা। বললেন, 'আমারতো পা নেই। দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। তুমি আমার পা ছুঁবে কিভাবে?'
দাউদের চোখ ভেজা। বলে, 'যেটুকু আছে তাই স্পর্শ করে আমি আমার জীবন ধন্য করতে চাই।' দাউদ আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাদশা ভাইয়ের পায়ের উপরের অংশ ধরে বসে থাকে। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। আমিও বাদশা ভাইয়ের আরেকটি কাটা পা ধরে বসে থাকি।
ফেরার পথে বড় সড়ক ধরে আমরা হাঁটছিলাম। আমি দাউদকে বললাম, 'এই সড়কটি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে নামকরণ করা হয়েছে। শহীদ বদি সরণী। এই সড়ক দিয়ে হাঁটার কোনো অধিকার আমাদের নেই।'
'কেন?' দাউদ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।
শহীদ বদি আমাদের গ্রামের মানুষ। যুদ্ধের সময় অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে লুকিয়ে গ্রামে এসেছিল। কিন্তু খবরটি বড়চাচা মানে তোর বাপ জেনে যায়। তিনি পাক আর্মিদের খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে আসেন। পাক আর্মি আর বড় চাচার নির্দেশে পাকিস্তানি মিলিটারিরা বদির বাড়ি ঘেরাও করে। তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। বদি আত্মসমর্পণ করে না। সে একাই বিশাল পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। একসময় স্ত্রী ও তিনি দু'জনই শহীদ হন।'
এবার দাউদ দু'হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নিঃশব্দে কিছু সময় কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভেজা চোখে বলে, 'ঠিকই বলেছিস, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটার কোনো অধিকার আমাদের নেই। যদি এমন হতো–আমাদের বাপ-চাচা কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। আর তার নামে এই রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে–তা'হলে কেমন হতো? হাঁটতে গেলে আমাদের বুকটা গর্বে ভরে উঠতো। আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম, 'এই দেশটা আমাদের। এই দেশের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে।'
দাউদ আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সড়ক থেকে আঁলপথে নেমে পড়ে। বলে, 'তুইও নেমে আয়। শহীদের পবিত্র রক্তে রাঙানো এই সড়ক। আমাদের কলঙ্কিত পদস্পর্শে অপবিত্র করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। এ দেশের আলো বাতাসও আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।' বলেই দাউদ আলপথ ধরে দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।■

কবিতা

অচেনা
মাহবুব সাদিক

তাকে বলি: কপাল ও কপোল থেকে মুছে ফেলো
বিষাদের বলিরেখা–
দূরে রাখো দুর্বিপাক, প্রাণ খুলে হাসো
ঠাকুরের জ্যোৎস্নাবোনা পঙক্তি আওড়ে বলি:
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো,
হয়তো কথাটা শোনে– নাকি কিছুই শোনে না
বুঝি না কিছুই;
ঘাড় গুঁজে বসে থাকে একালের ত্যাঁদর মানব,
স্বপ্নহীন আবছা জটিল কোনো বিবশ আলোর ঘূর্ণি
নাচে তার চোখে,
মনে হয় আগুনে গোলার মতো দুষ্পাঠ্য ও দুর্বোধ্য
এ এক হিস্পানি ষাঁড়ের চোখ
খাপখোলা ছুরির মতো চোখা শিং নরম মাংসে
গেঁথে দেয়া ছাড়া যার অন্য কাজ নেই,

সে কোনো কথাই বলে না–
কেন যে আমার মনে হয়– এ তো কোনো মানব নয়
খুঁফোর মন্দির থেকে তুলে আনা অসম্পূর্ণ
মানুষের শব, নাকি
দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের তৃতীয় জগত থেকে উঠে এসে
আজ কেউ বসে আছে আমার সম্মুখে?

বনভূমি, মেঘ অন্য কিছু
নাসির আহমেদ

অন্ধকারে কেমন করে দেখলে তুমি আলো
ভৌতিক সেই আলোই মনে সহসা চমকালো
ভয়ের দত্যি এগিয়ে এলো ছড়িয়ে কালো ধোঁয়া
সঞ্চয়ে যা সাহস ছিল সবই গেল খোয়া।

সাদাকালো মেঘের ঝাঁকে এ কোন হাতির পাল
ছুটছে আকাশ দাপিয়ে হঠাৎ চৈত্রে বর্ষাকাল!
জমাট মেঘের দেখছো হাতি আমি তো কাশফুল
সাদা কিছু মেঘই দেখি, কার দেখাটা ভুল?
বনভূমির অন্ধকারে ভোরের সূর্য ছড়ায়
সোনারোদের ঝিকিমিকি আলোতে সব ভরায়
তুমিই শুধু বনভূমির অন্ধকারে একা
থমকে আছো আতঙ্কিত, পাও না আলোর দেখা!

টানছো তুমি কালো চুরুট এসট্রেতে ছাই ভরা
আমি দেখছি চুরুটতো নয় ছোট বসুন্ধরা
ড্রইং রুমে হঠাৎ আকাশ এসট্রে পাখি হয়ে
উড়েই গেল ছড়িয়ে ডানা বাতাস গেল বয়ে।
কার দেখাটা সত্যি এবং কোনটা যে বিভ্রম
ভাবতে গেলেই দ্বন্দ্বে নিজের আটকে আসে দম।

বিচ্ছেদ
কামাল চৌধুরী

উপসংহারের আগে বিচ্ছেদের পত্রে লেখা ধুলাবালি কাদার অক্ষর
সেখানেই বেইলি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে অলিখিত যুদ্ধ বিমান
বিজয়ের জন্য আমার সাঁতার শেখা জলের পাশে বিধ্বস্ত নদীতীর
তুমি শুনতে পাচ্ছ চর জাগার শব্দ আর নদী ভাঙনের অমিতাচার

কোথাও হারিয়ে গেলে ফের বসতির পাশে অফুরন্ত নীরবতা
তাঁবু জীবনের উৎসব শেষে আমাকে ভাসিয়ে দিও লুপ্ত জলে
আত্মজীবনীর একভাগ আমার অসতর্ক চুম্বনগলি
বাকি অংশে আমি পাল তুলে দিয়েছি একা একা বেদনা জাগাতে।

নিদ্রাস্তুতি

কামাল মাহমুদ

আমার একটা চোখ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে
অন্য চোখটা নেহাৎ অনিচ্ছায় জেগে আছে

ঘুমিয়ে পড়া চোখটা সুখে স্বপ্ন দেখছে–
সবুজ মাঠের মধ্যে একজোড়া সাদা খরগোশ ছুটছে
কোনো রাক্ষুসে শিয়াল-কুকুর তাদের তাড়া করছে না
সবুজে-শিশিরে মহানন্দে খেলা করছে ওরা
বৃক্ষেরা ছায়া দিচ্ছে, পাখিরা সাঁতার কাটছে
ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার
'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে'...

জেগে থাকা চোখে অন্য দৃশ্য–
মাঠে পোড়া ঘাস, মাটিতে ফাটল
গাছে পাতা নেই, পাখপাখালির নামগন্ধও নেই
ভীত ইঁদুরের গর্তের মুখে ক্ষুধার্ত সাপের পাহারা
–চোখের শান্তি হয় সেরকম কিছু নেই

ঘুমানো চোখকে ডেকে এই বাস্তব বর্ণনা দিল জাগা চোখ
সে বললো, কেন মিছে জেগে মরছিস, জোর করে ঘুমিয়ে পড়
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ
এরচে' সুখ আর কিচ্ছুতে নয়
না হলে অন্তত মটকা মেরে পড়ে থাক, তাও কিছু নির্ভার

জাগা চোখ একা পুড়তে থাকলো তার রাজ্যের দাহে...

একটি নীল ফড়িং

মাহফুজ মুজাহিদ

খুব ইচ্ছে নিয়ে নদীর কিনারে হেঁটে এসেছি দীর্ঘ বিকেলফোঁটা বাবুইয়ের গ্রাম। তালতলায় একটা নীল ফড়িং দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যাবার প্রাক্কালে, ঝুমুর তালে দৌড়ে এসে কেউ একজন খুলে নিলো সমস্ত অভিশাপ। ঘুমফোঁটা চোখে না দেখায় স্পর্শ ফুড়িয়ে উড়ে যায় ঘুড়ি। প্রেমালাপঘোর জ্যোৎস্নায় উবেছে ঢের নতুন গহীনে। কবিতার খাতাজুড়ে বিষণ্ন ছড়িয়ে দিয়ে অভিশপ্তের নামলিপিতে যুক্ত হয়ে ওঠে পুরুষোত্তম সুন্দর।
আমার একটা নীল ফড়িং চাই। যার সবুজ ডানার হলদে আভায় ঘাসফুল হতে ইচ্ছে করবে খুব। ষড়-ঐষর্যে মেখে রাখি তার কুসুমিত সুঘ্রাণ। অথচ কবি প্রেমিক হয় না কখনো; জেনে রাখি কাব্যের নিখুঁত বাণীর অমিয় শব্দের ঘোরে।
মনতলায় মন হারিয়ে গেলে– তুমি ও আমি তখন নিজস্বী বুনতে থাকি। একটি নীল ফড়িং হেঁটে গেলে স্মৃতির আল্পনায় জেগে ওঠে অজস্র শস্যফুল। রোদহীন মেঘ হয়ে সবুজ ডানায় ছোপ ছোপ নীল জেগে ওঠে বিষাক্ত বাতাসে।
তুমি জেনে গেছো; একটি নীল ফড়িং আমি চাই; খুব করে চাই পাঁজরের অন্দরে, মানুষের অন্তরে। মানুষ কখনো ভালোবাসতে শেখায়নি, ভালোবাসা মানুষ হতে শিখিয়েছে চিরকাল।

নিজস্ব আঙিনার মুখ

জাকির আবু জাফর

মন যেনো নিজেই নিজের ডানা গজিয়ে ছড়িয়ে দিলো
আকাশের নীল সমুদ্রব্যাপী
তারপর নীলের কলবে লেখে মনান্তরের চিঠি
চিঠির শরীর জুড়ে তোমার সম্ভ্রান্ত বাণী দুলছে দুধ সাদা
মেঘের পাঁপড়িতে
এমন মেঘই তোমার স্বপ্নের মৌন মানচিত্রের দেহে ঝুলছে

আকাশের নৈশব্দিক চিত্রকলা দেখে দেখে
আকাশের সংগী হয়ে উঠেছে তোমার মন
বেদনার রঙ যদি জেগে ওঠে মনের ভেতর
সমুদ্র জলে ধুয়ে নাও তাকে
ধুয়ে নাও রাতের চোখ থেকে ঝরা শিশির জল
তোমার দুঃখরা কালো মেঘ হয়ে
ঘূর্ণি তোলে আকাশের বুকে
এসব মেঘেরা পৃথিবীর বাতাসে নেমে এলেই
অশ্রুতে ভরে ওঠে সময়ের চোখ
স্বপ্নের রুমালে চোখ মুছে
হয়ে যাও নতুন পৃথিবী হয়ে যাও পৃথিবীর বিরল পাখি
হয়ে যাও মানব বান্ধব সমুদ্র বাতাস
তারই শীতল ছোঁয়া নেভায় দুঃখী হৃদয়ের আগুন
নেভায় হতাশার হাহাকারে দাউ দাউ চোখের অনল

শান্তির সুশীল বাতাস যখন ছড়ায় তোমার প্রাণ
নতুন উদ্যান যেনো গড়ে তোলে পৃথিবীর বুক
সেই উদ্যানের এক অঘুমো পাখির নাম তুমি জানো
তারই পাখাগুলো জুড়ে দিলাম তোমার মনের পিঠে
উড়ে যাও তুমি উড়ে যাও নতুন পৃথিবীর দিকে
উড়ে যাও নিরাপদ জলের অবিশ্রান্ত আশ্রয়ে
বৃক্ষের শরীর থেকে ঝরে যাচ্ছে যেসব পাতা
তাদের কুড়িয়ে জড়িয়ে দাও বুকের সবুজ ওম
পৃথিবীর মানুষেরা দেখুক
কিভাবে জীবন ফিরিয়ে দাও জীবনের কাছে
দেখুক তোমার নিজস্ব আঙিনার মুখ
পাখিগুলো ঠোঁটে তোলে জীবনের গূঢ় কলরব
পৃথিবীর সব আশ্রয়গুলো জমা হোক তোমার আশ্রয়ে

বুরো'র ঋণ ও সঞ্চয় সেবা এখন বিকাশে

বিজয় ভৌমিক

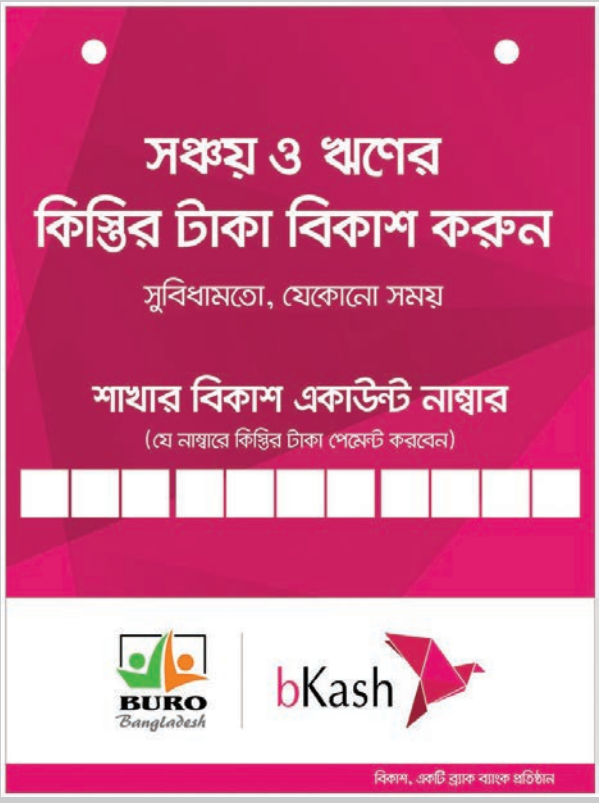

প্রতিটি শাখার বিকাশ নাম্বার প্রদর্শনের পিভিসি বোর্ড

প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে সারাবিশ্ব যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, সেই একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও এগিয়ে চলছে। যে বাংলাদেশে একসময় মোবাইল ফোন ধনীর ব্যবহারের বস্তু ছিল, তা এখন সময়ের সাথে সাথে ধনী-গরিব সকলের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্যে পরিণত হয়েছে। মোবাইল ফোনের বিস্তারের সাথে সাথে এদেশের মানুষের সুবিধার্থে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা সহজে বলতে গেলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদানের সুবিধা; যা সহজ, নিরাপদ ও দেশের সকলপ্রান্তের মানুষের জন্যে সহজলভ্য। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের সহজলভ্যতার জন্যে এদেশের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ৩ কোটি মানুষ এখন বিকাশ, রকেট, নগদসহ আরো অন্যান্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে প্রায় ১২০০-১৪০০ কোটি টাকা লেনদেন, বিল পেমেন্ট, বেতন গ্রহণসহ আরো নানান সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বুরো বাংলাদেশ তার সদস্যদের মধ্যে এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেনের উৎসাহ অনুভব করে এবং বিগত ৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল অঞ্চলের ২টি শাখার মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচির সূচনা করে। কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি বিভাগের DFS টিম, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও বিকাশের সহযোগিতায় ডিসেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত ১৫টি অঞ্চলের প্রায় ৫৫০০ মাঠ কর্মীকে বিকাশের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন ও সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে; যা কর্মীদেরকে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণে যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। বুরো বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত মোট ৫৮৯টি শাখায় এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। বর্তমানে এই সকল শাখার সকল সদস্যগণ তাদের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি বিকাশের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশে প্রদান করতে পারছেন। সদস্যগণ এই পাইলটিং কার্যক্রমে ব্যাপক পরিমাণে সাড়া দিয়েছেন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫৭০০০ লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি টাকা সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান করেছেন।

বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি বিভাগ, নিজস্ব আইসিটি বিভাগ ও বিকাশের সহযোগিতায় সয়ংক্রিয় API যোগাযোগের মাধ্যমে এমন একটি প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি তৈরি করেছে, যা যে কোনো মাইক্রো ক্রেডিট/মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচিতে সংযুক্ত করতে পারে। এতে যেমন প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল লেনদেনে ম্যানুয়াল কোনো কাজ নেই, সেই সাথে নেই কোনো আর্থিক অনিয়মের সুযোগ। প্রতিটি লেনদেনই নিরাপদে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্যদের হিসাবে যুক্ত হচ্ছে এবং লেনদেনকৃত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি শাখার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে যাচ্ছে। এতে সদস্যরা যেমন নিরাপদে লেনদেন করে উপকৃত হচ্ছেন; সেই সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যক্রমও গতিশীল হচ্ছে এবং নগদ লেনদেনের ঝুঁকি কমছে।

এই কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ বিকাশের সাথে সদস্যদের জন্যে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে নতুন একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে; যেখানে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সদস্যগণ কোনো প্রকার খরচ ছাড়াই বিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় সদস্যগণ লেনদেনের খরচ ১%, বিকাশের মাধ্যমে প্রদান করার সাথে সাথেই সমপরিমাণ অর্থ

তার বিকাশ অ্যাকাউন্টে ক্যাশব্যাক হিসেবে ফেরত পাবেন। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৩১ মার্চ, ২০২০ সালের মধ্যে বুরো বাংলাদেশের সদস্যগণ ৩০ লক্ষের বেশি লেনদেন সম্পন্ন করবেন বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। ইন্সট্যান্ট ক্যাশব্যাক অফারে সদস্যরা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেনদেনে উৎসাহিত হচ্ছে, সেই সাথে বুরো বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত কর্মীগণ সদস্যদের ডিজিটাল লেনদেন সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হচ্ছে; যা ৩০ লাখ লেনদেনের লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ১৮,৬৭১ জন সদস্য ৩২,৬২১টি লেনদেনের মাধ্যমে ৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা লেনদেন করে এই ক্যাম্পেইনের ক্যাশব্যাক অফারটি গ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় একজন বিকাশ গ্রাহক মাসে সর্বোচ্চ ১০টি লেনদেনের মাধ্যমে সর্বমোট ৫০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন অর্থাৎ সহজে বলতে গেলে একজন বিকাশ গ্রাহক মাসে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয় ও ঋণের হিসাবে জমা করতে পারবেন কোনো রকম খরচ ছাড়াই। এই কার্যক্রমকে আরো বেশি সংখ্যক সদস্যদের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের সময় অপচয় ও নগদ টাকা লেনদেনের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে, যা সংস্থার অপারেটিং ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে। একই সাথে আরো বেশি সংখ্যক প্রান্তিক অঞ্চলের সদস্যদেরকে সংস্থার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাবে। এতে করে অর্থনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে বুরো বাংলাদেশ আরো ব্যপকভাবে তার অবদান রাখতে পারবে।■

শাখার ক্যাম্পেইন প্রদর্শনী ব্যানার

■ ফিল্ড ম্যানেজার, ডিএফএস

শাখা থেকে সদস্যদের প্রদান করার জন্য ক্যাম্পেইন লিফলেট

নিরাপদ খাবার যেভাবে অ-নিরাপদ হয়

এ. বি. এম. তাজুল ইসলাম

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বছর, ভূতত্ত্ববিদদের ধারণামতে পৃথিবীর বয়স ১৫০-২০০ কোটি বছর, রুশ বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর বয়স ২০ লাখ বছর। পৃথিবীর বয়স ও সৃষ্টি নিয়ে যেই মতবাদই থাকুক না কেন একটি বিষয় সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ ও প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অনিবার্য। খাদ্য, পানি ও বাতাস ব্যতিত কোনো প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমাদের বায়ু দূষিত, পানি দূষিত, খাবারও ভেজাল তারপরও আমরা বেঁচে থাকি-বেঁচে আছি সৃষ্টিকর্তার পরম করুণায়।

প্রকৃতি প্রদত্ত সব কিছুই নির্মল এবং বিশুদ্ধ কিন্তু এগুলো অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয় রূপান্তরিত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিরূপ করে ফেলেছি যার ফলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণুজীব ও জীবাণু দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং নতুন নতুন জীবাণুর উদ্ভব হচ্ছে। নানা প্রকারের জীবাণু আমাদের জীবনকে নানাভাবে বির্পযস্ত করে তুলছে।

অভিধানে খাদ্য সর্ম্পকে বলা হয়েছে ভোজ্যদ্রব্য, ভোজনযোগ্য খাবার। বিভিন্ন

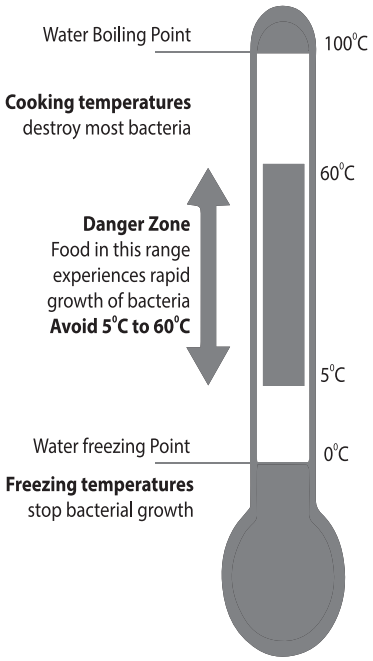

কারণে খাদ্য একইসাথে অখাদ্য হয়ে যেতে পারে, যা খাওয়ার অযোগ্য। কোনো খাদ্য খাওয়ার অযোগ্য হলে সে খাদ্য শরীরে কোনো পুষ্টি সরবরাহ করে না; উল্টো এমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা আমাদেরকে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। রোগতত্ত্বের মধ্যে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে খাদ্যবাহিত রোগ; যাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Food Born Disease যা মূলত খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে হয়ে থাকে।

যদিও যে কোনো বয়সী মানুষই খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবুও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। যেমন:

ক) ৫ বছরের কম বয়সী শিশু

খ) গর্ভবতী

গ) ৬৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তি

ঘ) অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমন– ডায়াবেটিস রোগী, লিভারের অসুখ আক্রান্ত রোগী, কিডনি রোগী, কেমোথেরাপি গ্রহণ করা ব্যক্তি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (WHO) মতে শুধুমাত্র খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning) ও অনিরাপদ

পানির কারণে সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ২২ লাখ মানুষের জীবনহানি ঘটে এর মধ্যে ১৯ লাখই শিশু। সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান না থাকলেও খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে আমাদের দেশেও প্রতি বছর অনেক প্রাণহানি ঘটে। International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) এর গবেষণার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিদিন ৫০১ জন মানুষ অনিরাপদ পানি ও Food Poisoning এর কারণে ডায়রিয়া, বমি ও পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন এবং এর মধ্যে অনেকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে যায়।

যে কোনো খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে; উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, পক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে যে কোনো খাদ্য খাবার টেবিলে পৌঁছে। শস্য খেত থেকে টেবিল, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে খাদ্যবস্তু রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে, বা Food Contaminated হতে পারে, এমনকি রান্না করা খাবারও ফ্রিজে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ

কিছু ক্ষুদ্র অণুজীব যেমন- ব্যাকটেরিয়া (Salmonella, E. coli, Listeria, Clostridium, Bacillus, Streptococcus) ভাইরাস (Hepatitis A virus, Norwalk virus) ছত্রাক (yeasts, Molds) ও বিভিন্ন প্রকার পরজীবী'র (Giardia, Entamoeba, Ascaris, Diphyllobothrium) কারণে খাদ্য বিষাক্ত হয় এবং মানুষ খাদ্যবাহিত রোগের শিকার হয়, আর এ সবই Biological Hazard হিসেবে পরিচিত।

অনেক ক্ষেত্রেই খাবার নিরাপদ হলেও অমাদের সচেতনেতার অভাবে বা অজ্ঞতার কারণে আমরা খাবারকে অনিরাপদ করে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করি। নানা কারণে নানাভাবে যে কোনো নিরাপদ খাবার যে কোনো সময় অনিরাপদ হয়ে যেতে পারে, সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হল-

অপরিচ্ছন্ন জায়গা, ড্রেনের পাশে বা নোংরা স্থানে পশু জবাই করার কারণে জবাইকৃত পশুর মাংস ক্ষতিকর জীবাণুর সংস্পর্শের দূষিত হতে পারে; যা আমাদের দেশে মাংস বিক্রেতা বা কসাইরা সচরাচর করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পশু সুস্থ-সবল হওয়া সত্ত্বেও শুধু মাত্র অপরিচ্ছন্ন নোংরা স্থানে পশু জবাই করার কারণে এর মাংস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যে কোনো মাংস সঠিক তাপমাত্রায় (১৬৫-১৭০°F) রান্না করা হলে বিদ্যমান জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যতিত সঠিক তাপমাত্রা নিরুপণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সাধারণত ফুড থার্মোমিটার ব্যবহারের প্রচলন নেই। তাই সাধারণভাবে মাংস ভালভাবে সিদ্ধ হলে ধরে নেওয়া যায় রান্নার সময় উপযুক্ত তাপমাত্রা বিদ্যমান ছিল।

কিছু কিছু কোম্পানির প্যাকেটজাত ডিম ব্যতিত সব খামারিই সরাসরি খামার থেকে ডিম বাজারজাত করে থাকেন। এতে ডিমে খামারের ময়লা আবর্জনা লেগে থাকে; যা অনেক জীবাণুর উৎস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দোকান থেকে ডিম কেনার পর না ধুয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করি। এতে করে ডিমের মধ্যে (বাহ্যিক অংশে) বিদ্যমান জীবাণু ফ্রিজে সংরক্ষিত অন্যান্য খাদ্যকে দূষিত করতে পারে।

যদি মুরগীর প্রজনন অঙ্গসমূহ সংক্রমিত হয়ে থাকে (Infaction in reproductive organ) তাহলে মুরগীর ডিম ও জীবাণু (Salmonella) দ্বারা সংক্রমিত হয়। তাই আধা সিদ্ধ ডিম বা কুসুম কিছুটা কাঁচা রেখে ডিম পোচ খাওয়া নিরাপদ নয়।

দুধ ভালভাবে না ফুটিয়ে পান করা মোটেও নিরাপদ নয় কারণ অপাস্তুরিত দুধে Salmonella, Campylobacter, Listeria জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সক্রিয় উপস্থিতি থাকে; যা সঠিকভাবে পাস্তুরিত না হলে এ সকল জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় না, ফলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাসার কাজের মানুষের দ্বারা মাছ-মাংস, শাকসবজি কোটা-বাঁটা করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে দা, বটি বা ছুরি দিয়ে মাংস কাটা হয় সেই একই দা, বটি না ধুয়ে শাকসবজি বা পেঁয়াজ-রসুন কাটা হচ্ছে এর ফলে যদি ঐ মাংস জীবাণুদ্বারা দূষিত হয়ে থাকে তাহলে তা শাকসবজিতেও সংক্রমিত হবে যা অন্য নিরাপদ খাবারকেও অনিরাপদ করে তোলে।

ডিপ ফ্রিজে কাঁচা মাছ-মাংসের সাথে রান্না করা মাছ-মাংস দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করার সময় অবশ্যই বায়ুরোধী খাবারের বক্স বা ফুড কনটেইনারের ঢাকনা ভালভাবে বন্ধ করে (Airtight) রাখা উচিত; না হয় কাঁচা মাছ মাংস থেকে Salmonella, E. coli, Campylobacter, Clostridium জাতীয় প্রাণঘাতী জীবাণু রান্না করা খাবারে ছড়াতে পারে।

রান্নার ২ ঘন্টার পরই খাবার ফ্রিজে রাখা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া খাবার স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হলে ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণের সময় সর্ম্পকে ধারণা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফ্রিজে রাখা খবারও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে তাই ফ্রিজে কতদিন পর্যন্ত খাবার নিরাপদ থাকে সে সর্ম্পকিত একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হল।

খাদ্য সমূহ	রি ফ্রিজিরেটর এ সংরক্ষণ সময়কাল (৩৫-৪০° F)	ফ্রিজারে সংরক্ষণ সময়কাল (০° হতে-২০° F)
দুধ বা দুগ্ধ জাতীয় খাবার		
দুধ	১ সপ্তাহ	১ মাস
বাটার	২ সপ্তাহ	১২ মাস
চিজ	১ সপ্তাহ	৩ মাস
আইসক্রিম(বক্স খোলার পর)		২-৩ সপ্তাহ
পুডিং	১-২ দিন	
মাংস ও ডিম জাতীয় খাবার		
কাঁচা মাংস	১-২ দিন	৩-৪ মাস
রান্না করা মাংস	২-৩ দিন	২-৩ মাস
মিট বল,সসেজ,মাংস দিয়ে তৈরীকৃত সালাদ	২-৩ দিন	২ মাস
ডিম	২-৪ সপ্তাহ	
খোসা ভাঙ্গা ডিম বা ডিমের কুসুম	২-৩ দিন	
রান্না করা ডিম বা সিদ্ধ ডিম	৭ দিন	
মাছ জাতীয় খাবার		
কাঁচামাছ	১ দিন	৩-৪ মাস
রান্না করা মাছ	৩-৪ দিন	১ মাস
ভাজা মাছ	৮-১০ দিন	২-৪ সপ্তাহ
চিংড়ি	৩-৫ দিন	৬-১২ মাস

Source: Instititute of Agriculture and Natural Resources

জীবন ও খাদ্য একে অপরের পরিপূরক। যে খাদ্য আমাদের জীবন বাঁচায়, সেই খাদ্যই যদি অখাদ্যে রূপান্তরিত হয়, জেনেই হোক আর না জেনেই হোক তা গ্রহণের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। কারণ খাদ্যবস্তুতে জীবাণুর উপস্থিতি আমাদের জীবনকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের সবার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।■

● সহকারি কর্মকর্তা-কৃষি

কিডনী রোগ : লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার

ডা. সোহেলী শারমীন শান্তা

কিডনী বা বৃক্ক আমাদের মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি। এটি আমাদের শরীরের মূত্রতন্ত্রের একটি অংশ। কিডনীর প্রধান কাজ হলো রক্ত থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করা এবং রক্তের পরিশোধন করা । এছাড়াও কিডনী অতিরিক্ত পানি, খনিজ পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থ দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের শরীরের পানি, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস এবং বাই-কার্বোনেটের মত পদার্থের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করাও কিডনীরই কাজ। এছাড়াও কিডনী ইরাইথ্রোপয়েটিন নামক হরমোন তৈরী করে যা লোহিত রক্ত কণিকা তৈরী করে। কিডনী আমাদের শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের অন্যতম অঙ্গও বটে।

কিডনীর রোগ সমূহ

১. ক্রনিক কিডনী ডিজিজ: এতে কিডনী ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে এবং পুনরায় ঠিক হয় না।

২. গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস।

৩. পলিসিস্টিক কিডনী ডিজিজ : আনুমানিক প্রতি ১০০০০ (দশ হাজার) লোকের মধ্যে একজনের এই রোগ দেখা যায়। এটি একটি বংশানুক্রমিক রোগ। এক্ষেত্রে রোগীর ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেক সন্তানের এই রোগ ভোগের সম্ভাবনা থাকে।

৪. ইউরেনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন : এটি পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশি হয়ে থাকে।

কিডনী রোগের কারণ

১. ডায়াবেটিস : এটা খুবই দুঃখের যে শতকরা ৩০-৪০ শতাংশ ক্রনিক কিডনী ফেইলিওরের রোগীর বা প্রতি ৩ জন ক্রনিক কিডনী ফেইলিওরের রোগীর একজনের কিডনী ডায়াবেটিসের কারণে খারাপ হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ক্রনিক কিডনী ফেইলিওরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই কারণে প্রত্যেক ডায়বেটিক রোগীর এই রোগের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২. উচ্চ রক্তচাপ : দীর্ঘ সময় ধরে যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে তা ক্রনিক কিডনী ফেইলিওরের কারণ হতে পারে।

৩. ক্রনিক গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস : এই প্রকারের কিডনী রোগীর মুখে বা হাতে-পায়ে পানি জমে ফোলা ভাব দেখা যায় এবং কিডনী ফুলে ধীরে ধীরে কাজ বন্ধ করে দেয়।

৪. বংশানুক্রমিক রোগ : পলিসিস্টিক কিডনী ডিজিজ। সাধারণত পি. কে. ডি রোগের নির্ণয় হয় যখন রোগীর বয়স ৩৫-৫৫ বছরের কাছাকাছি হয়। বেশির ভাগ পি. কে. ডি এর রোগীদের এই বয়সের আগেই সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। তাই এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

৫. পাথর রোগ : কিডনী আর মূত্র নালীর বিভিন্ন অংশের অবরোধের কারণে বা ইনফেকশনের ঠিকমত চিকিৎসা না করলে পাথর হতে পারে ।

৬. দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাওয়া (যন্ত্রণা নাশক ওষুধ ইত্যাদি) যেগুলি কিডনীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

৭. শিশুদের কিডনী বা মূত্রনালীর বারবার সংক্রমন।

৮. শিশুদের জন্মগত রোগ ও অবরোধ।

কিডনী রোগের লক্ষণ

১. প্রচণ্ড দূর্বলবোধ করা, ক্ষুধামন্দা ও বমি বমি ভাব হওয়া।

২. প্রস্রাব করার সময় কষ্ট হওয়া। যেমন :

- ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব হওয়া।
- জ্বালাপোড়া করা।
- পুজ পরা।
- রক্ত পরা।

৩. প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। আবার কখনও খুব ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ আসা।
৪. কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ।
৫. রক্ত সল্পতা।
৬. সকালে ঘুম থেকে উঠার পর পা, মুখ ও চোখের চারপাশ ফুলে যাওয়া।
৭. ত্বক শুকনো ও চুলকানি বোধ করা।
৮. মাংসে টান বা মোচড়ানো বোধ করা।

এই সব লক্ষণগুলো দেখে আমরা ধারণা করতে পারি যে কিডনী রোগাক্রান্ত। তবে এই লক্ষণগুলো অন্যরোগের কারণেও হতে পারে তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ। অবহেলার কারণে কিডনী রোগ অনেক সময় দেরিতে ধরা পড়ে। যখন কিডনী আর কাজ করতে সক্ষম থাকে না। যখন কিডনীর ৭০ শতাংশ বা তার বেশি খারাপ হয়ে যায় বা পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে দেয় সে অবস্থাকে বলে 'এন্ড স্টেইজ রেনাল ডিজিজ' বা সম্পূর্ণ কিডনী ফেইলর- ESRD বা ESKD। এর প্রধান কারণ হলো ডায়বেটিস এবং দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ। এই অবস্থায় সঠিক ওষুধ খাওয়ার পরও রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং সেই অবস্থা থেকে রোগীকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা নিয়মিত রূপে ডায়ালাইসিস করানো দরকার বা প্রতিস্থাপন করানো দরকার হতে পারে।

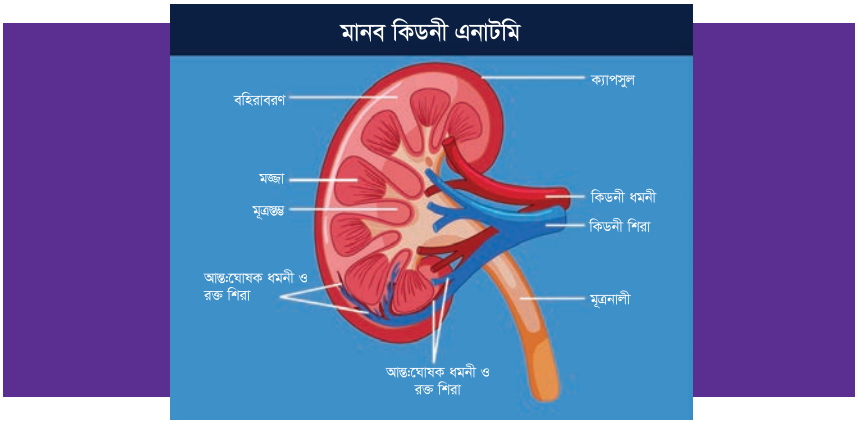

কিডনী রোগ কাদের হতে পারে?

যেকোন বয়সে কিডনী রোগ হতে পারে। তবে কারও কারও কিডনী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি তার নিম্নোক্ত কারণগুলি থাকে :

- ডায়াবেটিস থাকলে
- পরিবারে কিডনী ফেইলিওরের রোগী থাকলে
- বয়স ৬০ বা তার বেশি হলে
- নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় ধরে কিডনী হানিকারক ঔষধ সেবন করলে

কিডনী রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাসমূহ

১. Urinalysis or Urine Routing Microscopic Examination
২. Serum Creatinine
৩. Blood Urea Nitrogen
৪. Estimation of Glomerular Filtration Rate (GFR)

Acute kidney Failure কী?

এটি তখনই হয় যখন কিডনী হঠাৎ করেই তার কাজ আর করতে পারে না। অর্থাৎ অতিরিক্ত লবণ, পানি ও বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করতে পারে না। তখন শরীরে লবণ ও পানির পরিমাণ বেড়ে শরীর ফুলে যায়, এটি শরীরের জন্য শঙ্কাপূর্ণ। এই ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে থাকে। তাই খুব জরুরী ভিত্তিতে এর চিকিৎসা প্রয়োজন ।

কাদের AKF বেশি হয়

যাদের নিম্নোক্ত স্বাস্থ্য সমস্যার যেকোনটি থাকে-

- মারাত্মক ধরনের ইনফেকশন (Septicaemia), শক (Shock), হঠাৎ প্রচুর রক্তপাত।
- লিভারের রোগ
- যাদের ডায়াবেটিস ভালোমতো নিয়ন্ত্রণে থাকে না
- উচ্চ রক্তচাপ
- হার্ট ফেইলর
- ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

ক্রনিক কিডনী ডিজিজ বা সি. কে. ডি রোগীর খাদ্য-পানীয় নিয়ন্ত্রণের সাধারণ নীতি

- সর্বাধিক প্রোটিন গ্রহণ ০.৮ গ্রাম প্রতি কেজি শরীরের জন্য প্রতিদিন রাখা।
- শরীরে পর্যাপ্ত শক্তির যোগান দেওয়ার জন্য শর্করা এবং চর্বি জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্যালরির যোগান দেওয়া।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করা যাবে না।

কিডনী রোগ ও পটাসিয়াম (K+) এর সম্পর্ক

কিডনী রোগীর শরীরে পটাসিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি পটাসিয়ামের পরিমাণ বাড়তে থাকে তবে তা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- দূর্বলতা, বমি বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট ও বুক ধরফর করা। এই পরিবর্তনকে বলে Hyperkalaemia। যার জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রয়োজন। ফলের রস যেমন- ডাব, কামরাঙ্গায় প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে। তাই কিডনী রোগীদের ফল খাওয়া কমিয়ে আনতে হবে।

ডায়ালাইসিস ও কিডনী রোগ

রক্ত পরিশোধনের জন্য ডায়ালাইসিস একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া। যারা 'এন্ড স্টেইজ রেনাল ডিজিজে' ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে এটি করানো হয় কিডনী প্রতিস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত। ২ ধরনের কিডনী ডায়ালাইসিস রয়েছে-

১. হিমো-ডায়ালাইসিস।
২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস।

কিডনী রোগ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

কিডনী রোগ কেন হয়েছে সেই কারণের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। মূলত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিডনী রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের মাধ্যমে কিডনী রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। কিডনী রোগ প্রতিরোধে খাবার ও জীবন যাপনের কিছু পরিবর্তন আনতে হবে যেমন-

- ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার বর্জন করা।
- অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কমাতে হবে।
- তাজা ফল, সবজি ও আশ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।
- অতিরিক্ত পরিমানে চা, কফি ও কোমল পানীয় খাওয়া বর্জন করতে হবে।
- অ্যালকোহল বা যেকোন ধরনের মাদক ও ধূমপান বর্জন করতে হবে।
- ওজন কমাতে হবে।
- শারীরিক পরিশ্রম ও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করতে হবে।
- প্রচুর পানি পান করতে হবে।

● মেডিকেল অফিসার
বুরো হেলথ কেয়ার, টাঙ্গাইল।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা ২০১৯-২০

তাসলিমা বারী

বাংলাদেশ-এর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বুরো বাংলাদেশ তার প্রণীত নানাবিধ আর্থিক ও উন্নয়নমূলক সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে। একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপশি নতুন পুঁজি সৃষ্টি, সঞ্চয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ সহায়কের ভূমিকা পালন করছে।

বুরো বাংলাদেশে'র ঋণ কর্মসূচীসহ অন্যান্য সকল কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত ২০১৮-১৯ বর্ষের ঋণ ও সঞ্চয় পোর্টফোলিওসহ সকল অর্জিত ফলাফল বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়। ভবিষ্যতেও কর্মসূচীর আরো ভাল ফলাফল অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাকে সামনে রেখে গত ২২ সেপ্টেম্বর'১৯ থেকে বুরো বাংলাদেশ-এর ৭টি বিভাগ যথাক্রমে - ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং খুলনা ও ২৬টি অঞ্চলের সকল শাখা, এলাকা, আঞ্চলিক এবং বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে দিনব্যাপী মোট ৩৩টি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রথম অংশে অঞ্চল ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাখা, এলাকা এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে এবং

দ্বিতীয় অংশে বিভাগ ভিত্তিক এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সভাসমূহে ফারমিনা হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশনস), সমন্বয়কারী-কর্মসূচি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোতে কর্মসূচীর ভাল ফলাফল এবং বিগত অর্থ বছর ২০১৮-১৯ এ প্রায় ৩৭২ কোটি টাকা লাভ অর্জিত হওয়ায় সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশনস)-এর পক্ষ থেকে সকল কর্মীগণকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সভায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাকে অধিক ফলপ্রসু ও কার্যকর করার নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিগত জুলাই'২০১৮ থেকে জুন'২০১৯ পর্যন্ত ১ বছরের ফলাফল পর্যালোচনা, জুলাই' ২০১৯ থেকে সভা পর্যন্ত চলতি মাসের ফলাফল বিশ্লেষণ, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা আলোচনা এবং করণীয়, সদস্য/গ্রাহক সংগ্রহ সংক্রান্ত আলোচনা, রেমিটেন্স এবং সঞ্চয় সেবাপক্ষ উদযাপন, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার, খেলাপী নিয়ন্ত্রণ ও আদায়, চলতি এবং ২য় খাতার টাকা আদায়, OTR বৃদ্ধিকরণ, প্রতি রবিবার শাখার সাপ্তাহিক সভায় কর্মীপ্রতি লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন নিয়ে আলোচনা, এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং করণীয় সম্পর্কে আলোচনা, অটোমেশন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা, রেমিটেন্স সম্পর্কিত আলোচনা, ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন সংক্রান্ত আলোচনা, SMAP প্রসঙ্গে আলোচনা, DFS, ওয়াটার

ক্রেডিটসহ অন্যান্য প্রকল্পের অগ্রগতি প্রসঙ্গে পর্যালোচনাসহ প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

এছাড়া সভায় বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়সহ বিবিধ ও মুক্ত আলোচনায় শাখা এবং এলাকা ব্যবস্থাপকগণ কর্মসূচী সংক্রান্ত ও নিজেদের কর্মজনিত নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যা অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশনস) এর কাছে তুলে ধরেন এবং তিনি সকলকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা সভা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে সাপ্তাহিক রবিবারের সভাসমূহের মাধ্যমে কর্মীদের কাজের প্রতি জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং কর্ম প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। একই সাথে কর্মীদের নতুন দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আগ্রহ এবং পেশাদারিত্বের মনোভাব জাগ্রত হয়। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে কর্মীদের মধ্যে কাজের লক্ষ্যমাত্রা বন্টনসহ এবং অন্যান্য দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচীর গতি ত্বরান্বিত হয়। যা ঋণ ও সঞ্চয় পোর্টফোলিও বৃদ্ধিসহ সকল

কর্মসূচীর ভাল ফলাফল অর্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

বুরো বাংলাদেশ কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে; তার মধ্যে অন্যতম–দরিদ্র সদস্য/গ্রাহকদের জন্য মানসম্পন্ন আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা। দীর্ঘ মেয়াদে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেবা প্রদান এবং তাদের জীবনযাত্রার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ। আর সে কারণে কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা কার্যকর ও ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হয়।■

● সহকারী কর্মকর্তা, কর্মসূচি

বুরো বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক

জাকির হোসেনের জন্মদিন উদযাপন

একজন সাধারণ মানুষ তার চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন, কার্যক্রম ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে ওঠেন–তারই উজ্জ্বল উদাহরণ দেশের শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও ও এমএফআই বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের সংগ্রামমুখর নীলাকাশের এক নিবেদিত কর্মী। তিনি স্বপ্নচারী নন, স্বাপ্নিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সেই স্বপ্ন দেখেন যা বাস্তবায়নযোগ্য। তিনি তাঁর অদম্য সাংগঠনিক দক্ষতায় গড়ে তোলা 'বুরো বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে দেশ মাতৃকার উন্নয়নে পালন করে চলেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অহংবোধ বিবর্জিত একনিষ্ঠ সমাজ কর্মী এই মানুষটির মধ্যে আমিত্বের কোনো প্রাধান্য ঠাই পায়নি। তিনি তাঁর সাথে পথচলা বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করেছেন যে, 'বুরো বাংলাদেশ কোনো ব্যক্তির একার প্রতিষ্ঠান নয়, সবার প্রতিষ্ঠান'।

উদ্যমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও উন্নয়ন চিন্তার অগ্রসরমান জাকির হোসেন এর জন্ম টাঙ্গাইল শহরের কেন্দ্রস্থল আমঘাট রোডের পৈতৃক বাড়িতে ৩১ ডিসেম্বর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। শুধু পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই ডুবে থাকতেন না, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বই পড়তেন। প্রচুর আড্ডা দিতেন। খেলাধুলা করতেন, ব্যায়ামও করতেন। মনে-প্রাণে, পোশাকে-আশাকে, আচার-আচরণে ছিলেন দারুন স্মার্ট। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জড়িয়ে পড়েন প্রগতিশীল রাজনীতিতে।

সৃজনশীল জাকির হোসেন শুধু নিজেকে নিয়ে নন, ভাবেন পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিষয়ে। তাঁর অন্যতম মহৎ গুণ হচ্ছে মানবিকতা। তিনি বুরো বাংলাদেশের তাঁর দক্ষ সহকর্মীদের যেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন, তেমনি গুণী মানুষদের খুব সম্মান করেন। তাঁর এই বিরল উপলব্ধি তাঁকে এ সময়ের আলোকিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে বুরো বাংলাদেশ এখন ৬৪ জেলায় প্রায় ১১০০ শাখায় সুবিস্তৃত এক প্রতিষ্ঠান।

একজন স্বাপ্নিক জাকির হোসেন এখনো তারুণ্যের নিরলস উদ্যমী কর্মী। ক্লান্তিহীনভাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ান। তাঁর প্রত্যাশা, দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের দারিদ্র্য নিরসন ঘটবে, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে, প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটবে, স্বাস্থ্য সচেতনতা আসবে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে–যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, স্বাপ্নিক এই মানুষটির শুভ জন্মদিনে বুরো পরিবারের সকল সদস্যের প্রাণের বীণায় ঝংকৃত হয়েছিল আনন্দ গহনের সুর। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবক, আমাদের অতি আপনজন, আমাদের সুখ-দুঃখের অধিকর্তা প্রিয় জাকির ভাই।

অজস্র প্রাণের আবেগতপ্ত স্পর্শে, চৈতন্যেও তীব্র সংরাগ শ্রম ও সাধনার প্রবল উপস্থিতি ছিল প্রতিটি ফুলে। আমরা সত্যিই আপনাকে ভালোবাসি–তাই আপনার জন্মদিনের আনন্দে আমরাও উদ্বেলিত, উজ্জীবিত। আমাদের হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসায় সিক্ত করার সামান্য প্রয়াসের কিছু চিত্র এখানে উপস্থাপিত হলো।

অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বুরো'র শিক্ষা সহায়তা

বুরো বাংলাদেশ ২০১৬ সাল থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অদম্য-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে বের করে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে যাচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ও স্পৃহা অর্থ সংকটের কারণে যেন বিঘ্নিত না হয় সেটা নিশ্চিত করাই বুরো বাংলাদেশের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা সহায়তা প্রদান ২০১৯-এর আওতায় মোট ১০০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই শিক্ষার্থীরা আর্থিক সংকট ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে অদম্য-মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ বছর এই শিক্ষা সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে ৪টি পর্বে যথাক্রমে ঢাকা, মুধুপুর, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ ও শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আগামী জানুয়ারি ২০২০-এ খুলনায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী এবং মধুপুরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক জনাব মো. শহীদুল ইসলাম। টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার রায় এর অনুপস্থিতিতে তার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. কামরান হোসেন- সিনিয়র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার- মধুপুর সার্কেল। তিন পর্বের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আরিফা জহুরা, প্রফেসর এম. নাসিরউদ্দিন মজুমদার- অধ্যক্ষ, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম- অধ্যক্ষ, সিডিএ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। ঢাকা ও মধুপুরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এবং চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অর্থ জনাব এম মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানগুলোতে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক ও অতিরিক্ত পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন। ফারমিনা হোসেন বুরো বাংলাদেশ সম্পর্কীত একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশনও উপস্থাপন করেন।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি-২০১৯
নির্বাচিত অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী

জিনিয়া সুলতানা
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো : সায়েম হোসেন
পটুয়াখালী
বিভাগ: বিজ্ঞান

মোসা : আঁখি খাতুন
নওগাঁ
বিভাগ : বিজ্ঞান

মাহ্‌ফুজা আফরিন মিম
কুষ্টিয়া
বিভাগ: বিজ্ঞান

মোছা : পাপিয়া জাহান সাথী
নেত্রকোনা
বিভাগ : মানবিক

বিপ্র বালা
গোপালগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

মারিয়া
শরীয়তপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. সাব্বির মিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিভাগ : বিজ্ঞান

রাতুল আহমেদ
ঢাকা
বিভাগ : বিজ্ঞান

ইসমাইল হোসেন আকাশ
ভোলা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. বুলবুল হোসেন
বরিশাল
বিভাগ : বিজ্ঞান

মারিয়া আক্তার
বাগেরহাট
বিভাগ: বিজ্ঞান

সৈকত আহম্মেদ
নাটোর
বিভাগ : বিজ্ঞানী

মো. রাকিব হাসান
সিরাজগঞ্জ
বভাগ : বিজ্ঞান

ইয়াছিন ইসলাম
ফরিদপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মাহমুদা ইসলাম রাইনা
ময়মনসিংহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

সাদিয়া ফারহানা
লালমনিরহাট
বিভাগ : বিজ্ঞান

ফারিয়া খানম ইতিমনি
নেত্রকোণা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো : আরিফুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

সুবর্ণা হাসদা
দিনাজপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

সমাপ্তি রায় পাখি
দিনাজপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

ইমরানা আক্তার
মৌলভীবাজার
বিভাগ : বিজ্ঞান

জান্নাত
কুমিল্লা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. আশিকুজ্জামান আশিক
গাইবান্ধা
বিভাগ : বিজ্ঞান

লুসি ত্রিপুরা
বান্দরবান
বিভাগ : বিজ্ঞান

স্কী হাগিদক
টাংগাইল
বিভাগ : মানবিক

মো. সোহাগ মিয়া
ময়মনসিংহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

গৌরাঙ্গ চন্দ্র
পঞ্চগড়
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. রনি
কিশোরগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

আরাফাত হোসেন পৃথিবী
টাংগাইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোছা: নীলিমা জাহান
ময়মনসিংহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. উমর ফারুক
টাংগাইল
বিভাগ: বাণিজ্য

একরামুল হক
নাটোর
বিভাগ : বাণিজ্য

বৃষ্টি রানী
পাবনা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোসা: লিজা খাতুন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. জাহাঙ্গীর আলম
নাটোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোঃ সেলিম রেজা
টাঙ্গাইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

ফাতেমাতুজ জোহরা
টাঙ্গাইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

সুমাইয়া আক্তার সুমা
ময়মনসিংহ
বিভাগ : মানবিক

আরমানা জাহান মনিষা
টাঙ্গাইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

নাজনীন সুলতানা
ময়মনসিংহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

নুসরাত জাহান ইভা
টাঙ্গাইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

কামরুন নাহার কাব্য
জামালপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মুন্না আচার্য্য
নেত্রকোণা
বিভাগ : বিজ্ঞান

জিয়াছমিন আক্তার
লালমনিরহাট
বিভাগ : বিজ্ঞান

আফরোজা বেগম
লালমনিরহাট
বিভাগ : মানবিক

আলিফ মাহমুদ
টাঙ্গাইল
বিভাগ : সি.এস.ই

নিলয় কুমার নন্দী
রাজবাড়ী
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. আকাশ মিয়া
নেত্রকোণা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মামুন মিয়া
নেত্রকোণা
বিভাগ : মানবিক

আঞ্জুমান আরা
নেত্রকোণা।
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. শিপন মিয়া
ময়মনসিংহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

রেজাউল করিম
কক্সবাজার
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোহাম্মদ ইয়াছিন
কক্সবাজার
বিভাগ : বাণিজ্য

মোক্তার হোসেন
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. সাজ্জাদ হোসেন
কুমিল্লা
বিভাগ : বাণিজ্য

বৃষ্টি রানী দাস
চাঁদপুর
বিভাগ : মানবিক

দুলাল চন্দ্র দাস
কুমিল্লা
বিভাগ : বিজ্ঞানা

আফরিনা
নরসিংদী
বিভাগ : বিজ্ঞান

শাহিন সুলতানা
কক্সবাজার
বিভাগ : বিজ্ঞান

জেসমিন আক্তার
নোয়াখালী
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিভাগ : মানবিক

মোঃ বকুল ইসলাম
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
বিভাগ : বিজ্ঞান

মুনতাসির তাজওয়ার জিহান
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

সামছিয়া আফরিন
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

সুইটি আকতার
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বাণিজ্য

শাহানাজ আকতার
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোঃ ফজলে রাব্বি
কুমিল্লা
বিভাগ : বিজ্ঞান

ইশতিয়াক আহমেদ রাহাত
সিলেট
বিভাগ : বিজ্ঞান

প্রান্ত চন্দ্র দাস
হবিগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

মো. রাকিব মিয়া
টাঙ্গাইল
বিভাগ : বাণিজ্য

নিধি মজুমদার
চট্টগ্রাম
বিভাগ : বিজ্ঞান

স্বপ্না আক্তার
বাগেরহাট
বিভাগ : বিজ্ঞান

মারুফা খাতুন
সাতক্ষীরা
বিভাগ : বিজ্ঞান

ফারজানা আক্তার
সাতক্ষীরা
বিভাগ : বিজ্ঞান

স্বরসতী বিশ্বাস
খুলনা
বিভাগ: বিজ্ঞান

আফরিনা আক্তার সিম্মি
খুলনা
বিভাগ : বিজ্ঞান

সুরাইয়া বেগম
ভোলা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মানসুরা আক্তার
পটুয়াখালী
বিভাগ : বিজ্ঞান

সাইফুল
পটুয়াখালী
বিভাগ: বিজ্ঞান

দেবাশিষ অধিকারী
শরীয়তপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

সাদিকা মাহমুদ
শরীয়তপুর
বিভাগ : বাণিজ্য

হৃদয় হাজরা
গোপালগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

সুজন চন্দ্র রায়
দিনাজপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

হা-মীম
ভোলা
বিভাগ : বিজ্ঞান

সাদিয়া আফরোজ বাবলি
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

তাহেরা খানম
নড়াইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

শংকর সরদার
খুলনা
বিভাগ : বাণিজ্য

আয়েশা সিদ্দিকা
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

অনন্দীতা সরকার লোপা
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

স্বর্নালী বিশ্বাস
বাগেরহাট
বিভাগ : বিজ্ঞান

শিমুল হোসেন
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

মাহবুবা খাতুন
যশোর
বিভাগ : বিজ্ঞান

আমেনা পারভীন
নড়াইল
বিভাগ : বিজ্ঞান

মাজেদা খাতুন
নড়াইল
বিভাগ : মানবিক

মোঃ সোহাগ মিয়া
ঝিনাইদহ
বিভাগ : বিজ্ঞান

ফাতেমা খাতুন ঐশী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বিভাগ : বিজ্ঞান

সেতু খাতুন
পাবনা
বিভাগ : বিজ্ঞান

মুক্তা দাস
সুনামগঞ্জ
বিভাগ : মানবিক

মোঃ ইমরান আলী
নীলফামারী
বিভাগ : বিজ্ঞান

মোঃ ফারুক ইসলাম
দিনাজপুর
বিভাগ : বিজ্ঞান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সেরা করদাতা হিসেবে ২০১৮-১৯ কর বছরে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে 'অন্যান্য' ক্যাটাগরিতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এর নিকট থেকে গত ১৪ নভেম্বর ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও দেশখ্যাত উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব জাকির হোসেন। বিগত বছরেও বুরো বাংলাদেশ সেরা করদাতা হিসেবে ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননা লাভ করেছে।

ডর্প-এর স্বপ্ন মা সেরা দশ

২০০৫ সালে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে ১০০ মা-কে নিয়ে ডরপ ছোট আকারে এই কর্মসূচি শুরু করেছিল যা ২০০৭-০৮ থেকে সরকারিভাবে শুরু করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ১০০ গরিব মা ৭ শর্তযুক্ত মানদণ্ডে এই ভাতা পাচ্ছেন। ৩ বছর মেয়াদি এই ভাতা মাসে ৮০০ টাকা হারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরকারিভাবে প্রদান করা হয়। এরপর একে টেকসই রাখার জন্য 'মাতৃত্বকালীন ভাতা কেন্দ্রিক স্বপ্ন' প্যাকেজ করা হয়। ২০০৯-১২ সাল মেয়াদে স্পেনের মহামান্য রানী সোফিয়ার প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও সমর্থনে ২ ধাপে প্রায় ৬ কোটি টাকা অর্থায়নে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদনে ১ হাজার মাকে স্বপ্ন প্যাকেজের আওতায় এনে দেশের ৫টি নির্বাচিত উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়।■

গত ২৪ ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির ২৬তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরবর্তী মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভা নবনির্বাচিত পর্ষদকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন প্রদান করে। সভায় ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পর্ষদের বিদায়ী চেয়ারপার্সন সুখেন্দ্র কুমার সরকার।

বুরো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ প্রতি ৬ মাস অন্তর সকল নিরীক্ষকদের সমন্বয়ে ষান্মাসিক সমন্বয় সভা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নিরীক্ষা বিভাগের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও টীম লিডারদের সমন্বয়ে ষান্মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অতিথি উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন ও পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক।

এনজিও ফেডারেশন-এফএনবি'র ৯৩তম জাতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড সভা গত ২৯ ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ও এফএনবির চেয়ার এসএন কৈরী, ভাইস চেয়ার ও বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, আশার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়জার রহমান, সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল, ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, পদক্ষেপ-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক ইকবাল আহমেদ, ব্রেভ এর নির্বাহী পরিচালক এমএম আনোয়ার উল্লাহ, ডিএসএর পরিচালক ভগবতী ঘোষ, রাস এর নির্বাহী পরিচালক মো. লুৎফর রহমান বাবু, এফএনবি'র পরিচালক ও সদস্য সচিব মো. রফিকুল ইসলাম।

বুরো বাংলাদেশ ও লাবিব গ্রুপের সহযোগী সংস্থা এক্সেল টেলিকম লি. এর সাথে বুরো বাংলাদেশ এর গুলশান-২ এর প্রধান কার্যালয়ে গত ১৬ অক্টোবর-২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মরক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, এক্সেল টেলিকমের ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা জাহান (সিআইপি), স্যামসাং বাংলাদেশের সিনিয়র প্রফেশনাল বোমিন কিমসহ দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সমঝোতা স্বারকে স্বাক্ষর করেন বুরো বাংলাদেশ-এর পরিচালক অর্থ মোশাররফ হোসেন এবং এক্সেল টেলিকমের ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা জাহান (সিআইপ)।

ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদে এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ অন্যান্য পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বুরো বাংলাদেশ ফরিদপুরের উদ্যোগে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার।

বুরো বাংলাদেশ এর সার্বিক সহায়তায় টাঙ্গাইলের মধুপুরে 'কাকরাইদ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের' নতুন একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফা জহুরা।

বুরো ক্রাফটের পরিচালক বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা রাহেলা জাকিরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস-২০১৯ উপলক্ষে সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা'র সম্মানে ভূষিত করা হয়। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রাহেলা জাকিরের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম।

ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের ফার্মগেটে বুরো বাংলাদেশের ১০৭৯তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আজহার আলী, পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং এবিএম হুসেইন আহমেদ, এফসিএ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশ-এর কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোখলেছুর রহমান, ঢাকা মেট্রো অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত ১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাব ভবনে বুরো বাংলাদেশ এর সহায়তায় নির্মিত শাহীন স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করেন বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাকেরুল মাওলা, কবি মাহমুদ কামাল ও সাংবাদিক আতাউর রহমান আজাদ।

Australian Aid ও Opportunity International-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বুরো বাংলাদেশ 'মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। বুরো'র গ্রাহকসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকরী স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও স্বাস্থ্য অভ্যাস অনুশীলন উন্নত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এই প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক অর্থ, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচি, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়কারী কর্মসূচি।

গত ১১-২৫ নভেম্বর বুরো বাংলাদেশ সারাদেশে 'গ্রাহক সংগ্রহ, রেমিটেন্স ও সঞ্চয় সেবা পক্ষ ২০১৯' পালন করেছে। আরো অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে বুরো'র আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে এবং সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এই সেবাপক্ষ পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। তৃণমূল পর্যায়ে উঠান বৈঠক, গণসংযোগ ও ডিজিটাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত এই সেবা পক্ষ আশাতীত সাফল্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

গত ২১-২৩ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের আর্লিংটনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি নেটওয়ার্কিং সংস্থা SEEP-এর বার্ষিক সম্মেলন। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক এ সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। SEEP-এর বার্ষিক সম্মেলন-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল Building Resilience Through Market Systems। সম্মেলনে বুরো বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিত্ব করেন পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন।

গত ২২-২৩ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'এশিয়া প্যাসিফিক ক্ষুদ্রঋণ ফোরাম' এর ২য় বার্ষিক সম্মেলন। বুরো বাংলাদেশ এর অতিরিক্ত পরিচালক-অপারেশনস ফারমিনা হোসেন এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত বক্তা ও প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিগ্লোবাল আয়োজিত এই সম্মেলনে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল ও কার্যকরী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়।

"আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ"– এই অঙ্গীকার নিয়ে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০১৯-এর মানব বন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে বুরো বাংলাদেশ। ৯ ডিসেম্বর সকাল ১০:১৫ থেকে ১০:৩৪ মিনিট পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন থেকে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা মেট্রো অঞ্চলের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

শীতার্তদের মাঝে বুরো বাংলাদেশ-এর শীতবস্ত্র বিতরণ

সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে বুরো বাংলাদেশ প্রতিবছরই দেশের উত্তরাঞ্চলের শীতার্ত-দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এই শীতে শৈত্যপ্রবাহের পরপরই বুরো বাংলাদেশ তার রংপুর ও পাবনা বিভাগীয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে রাজশাহী, পাবনা, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার কয়েক হাজার দরিদ্র নারী-পুরুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণের এসব অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ।

রাজশাহী অঞ্চলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনিল কুমার সরকার, উপজেলা চেয়ারম্যান, বাগমারা; শরিফ আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাগমারা; মো. আব্দুল মালেক মন্ডল, মেয়র, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা। আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ইস্তাক আহমেদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

পাবনা অঞ্চলের শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. মোখলেছুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জয়নাল আবেদিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর ও মোতাহার হোসেন, চেয়ারম্যান, গয়েশপুর ইউনিয়ন পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান রিপন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক শামসুল আলম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খন্দকার মাহবুবুর রহমান।

ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনডিসি মো. আব্দুল কাইয়ুম খান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌসুমী আফরিদা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রানীশংকৈল; মো. শাহরিয়ার আযম মুন্না, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ; শেফালী খাতুন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, রাণীশংকৈল উপজেলা; মো. আবুল কালাম, চেয়ারম্যান, লেহেম্বা ইউনিয়ন পরিষদ রাণীশংকৈল। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. আওলাদ হোসেন।

কুড়িগ্রামের ভুরঙ্গামারি উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যাক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নবী চৌধুরী খোকন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএইচএম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী, পাইকের ছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক সরকার। বুরো বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম।

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির, মো. সাকিল আহম্মেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার; তৌহিদুজ্জামান স্বপন, চেয়ারম্যান, পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদ; মো. নাজমুলহুদা দুদু, সভাপতি, উপজেলা আওয়ামী লীগ; রওশন আলম রোলেক্স, সভাপতি, এফএনবি গাইবান্ধা জেলা। আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোতাহারুল ইসলাম।■

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০টায় বুরো বাংলাদেশ মধুপুর মানবসম্পদ কেন্দ্রে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের শুভ সূচনা এবং প্রকল্প অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দাতা সংস্থা Water.org বুরো বাংলাদেশ এর কাজের মান ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এই কর্মসূচিকে আরো বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছে। এরই প্রেক্ষিতে বুরো বাংলাদেশ দেশব্যাপী সংস্থার কর্ম এলাকায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মীদের এই কার্যক্রমে সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬টি অঞ্চলের ১০০০টি শাখার ২০০০ জন কর্মীকে পানি ও পয়:নিষ্কাশন কর্মসূচি বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১২৫০ জন শাখা ও এলাকা ব্যবস্থাপককে ওরিয়েন্টেশন প্রদানসহ আরো ৩ লাখ সদস্যের মধ্যে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্য ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে 'ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রাম' বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রোগ্রামটি সফল ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক অর্থ এম. মোশাররফ হোসেন, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, সমন্বয়কারী কর্মসূচি খন্দকার মোখলেছুর রহমান, সহকারী সমন্বয়কারী বিশেষ কর্মসূচি এসএমএ রকিবসহ সকল বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প কর্মীদের চলমান প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ নতুন প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশল অবহিতকরণ এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর মতামত ব্যক্ত করেন।■

স্পেশাল

পানেই ফিরেছে প্রাণ

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার মোহব্বতপুর গ্রামের তফাজ্জল হোসেন একজন ক্ষুদ্র চাষী। সর্বসাকল্যে কৃষি জমির পরিমাণ ২১০ শতাংশ। অনেক বছর থেকেই জমিতে ধান ও আলু চাষ করছিলেন কিন্তু কখনও কখনও খরচের টাকা উঠলেও আশানুরূপ বাজার মূল্য না পেয়ে লোকসানের বোঝা বহন করছিলেন বহু বছর ধরে। স্থানীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে গত কয়েক বছর ধরে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করেছেন পান চাষ, এতে লাভের মুখ দেখলেও পুঁজির অভাবে বাড়াতে পারেননি পান চাষের পরিধি। তার উদ্যম ও পরিশ্রমের মানসিকতা দেখে পুঁজির যোগান দিতে এগিয়ে আসে বুরো বাংলাদেশ।

২০১৮ সালে সংস্থার মোহনপুর শাখা বাংলাদেশ ব্যাংক ও JICA'র আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত SMAP প্রকল্পের আওতায় তাকে সদস্য করে ১ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করে। এ ঋণের টাকায় ১ বিঘা জমিতে নতুন করে সম্প্রসারিত করেন পান চাষ এবং সফলভাবে ঋণ পরিশোধ করার পর তফাজ্জল হোসেন ২০১৯ সালে SMAP সদস্য হিসেবে পুনরায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং পান চাষের আওতা বাড়ান ৩ বিঘা পর্যন্ত। খরচ বাদ দিয়েও শুধু পান বিক্রি থেকে গত এক বছরে নিট আয় করেন ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা। দরিদ্র তফাজ্জল হোসেন এখন এলাকার একজন সফল চাষী হিসেবে সবার কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যভাবে বলা যায় পানেই ফিরেছে তার প্রাণ।■

মোসাম্মৎ শ্যামলী। রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা। বুরো বাংলাদেশের মোহনপুর শাখার ১৪ নম্বর সমিতির সদস্য। স্বামী বুলবুল হোসেন পৈত্রিক সূত্রে ৪০ শতাংশ জমির মালিক। বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে সেই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে পান চাষ করছেন তারা। ঋণের টাকার একটি অংশ দিয়ে মাছও চাষ করেন তার স্বামী। মোটকথা, বুরোর ঋণসেবায় সচ্ছল জীবন যাপন করছেন শ্যামলী ও বুলবুল। যে পানে সুখী-সচ্ছল তারা, সেই পানের বরজ ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের, প্রত্যয়ের জন্য ছবিও তুললেন শ্যামলী।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

BURO programs pivot on

Clients' Choice

BURO Bangladesh

beside the poor since 1989

HEAD OFFICE

House # 12/A
Road # 104
Block # CEN(F)
Gulshan-2
Dhaka-1212
Bangladesh

TEL
880-2-9861202
880-2-9884834

FAX
880-2-9884832
880-2-9858447

EMAIL
buro@burobd.org
zakir@burobd.org

WEB
www.burobd.org

design : communicator